Bangladesh Journal of Political Economy

© 2015 Bangladesh Journal of Political Economy
Vol. 31, No. 1, June 2015, pp. 017-088
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

বাংলাদেশে মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের রাজনৈতিক অর্থনীতি*

আবুল বারকাত**

সারকথা *বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা উগ্র রূপ ধারণ করেছে। এ সাম্প্রদায়িকতা– অভ্যন্তরীণ ও সাম্রাজ্যবাদ-সংশ্লিষ্ট বহিঃস্থ উভয় শক্তির (উপাদানের) মাধ্যমে 'অর্থনৈতিক ক্ষমতা-ভিত্তিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া'কে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে প্রয়োগ করে সুসংগঠিত জঙ্গি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে উদ্যত। ধর্মের নামে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল মৌলবাদী জঙ্গিত্বের শেষ কথা নয়; বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করাই সম্ভবত চূড়ান্ত লক্ষ্য। বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার হোতা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো পৃথিবীর চারটি মৌল-কৌশলিক সম্পদের উপর তাদের নিরঙ্কুশ মালিকানা ও একচ্ছত্র কতৃত্ব-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা–জমি সম্পদ, পানি সম্পদ, তেল-গ্যাস-জ্বালানি-খনিজ সম্পদ, আকাশ-মহাকাশ সম্পদ। আর ঐ চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছানোর বিভিন্ন পথ-পন্থা-পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম হলো ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও জঙ্গিত্ব প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া (এ ক্ষেত্রে স্থান-কাল-পাত্রভেদে ধর্মের নাম বিভিন্ন হতে পারে)। বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ সৃষ্টি করেছে মূল ধারার রাষ্ট্রের মধ্যে আরেকটি রাষ্ট্র, মূল ধারার সরকারের মধ্যে আরেকটি সরকার, মূল ধারার অর্থনীতির মধ্যে আরেকটি অর্থনীতি (মৌলবাদের অর্থনীতি)। ধর্মকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের এ কৌশল আসলে ধর্মের 'mythos'-এর সাথে বাস্তবের 'logos'-এর সম্মিলন-উদ্ভূত এক দর্শন, যা ধর্মকে রাজনৈতিক মতাদর্শে রূপান্তরিত করে; আর ধর্ম-ভিত্তিক এ রাজনৈতিক মতাদর্শ ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত। ঐতিহাসিকভাবে পূর্ববাংলায় ইসলাম ধর্ম যখন উদারনৈতিক ও মানবিক প্রকৃতির তখন সমসাময়িককালে এদেশের অর্থনীতি, সমাজ, রাজনীতি-রাষ্ট্রনীতিতে এমন কি*

** অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ এবং পরিচালক, জাপান ষ্টাডি সেন্টার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

* এই প্রবন্ধটিকে 'মৌলবাদের অর্থনীতি', 'মৌলবাদের রাজনীতি', 'মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি', 'ধর্মভিত্তিক জঙ্গিত্ব', 'মৌলবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ' ইত্যাদি বিষয়াদি নিয়ে আমার বিগত ২০ বছরের (১৯৯৬-২০১৫) গবেষণা ফলসমূহের নিযার্স বলা চলে। আমার সংশ্লিষ্ট গবেষণার মধ্যে প্রকাশিত অন্যতম হলো নিম্নরূপ : '*বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতি*', ড. আবদুল গফুর স্মারক বক্তৃতা, ঢাকা: ২১ এপ্রিল ২০০৫; "*Economics of Fundamentalism in Bangladesh: Roots, Strengths, and Limits to Growth",* presented at South Asia Conference on Social and Religious Fragmentation and Economic Development, Cornell University: 15-17 October 2005; "*ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার : মহাবিপর্যয় রোধে সেক্যুলার ঐক্যের বিকল্প নেই*", সেক্যুলার ইউনিটি বাংলাদেশ, ঢাকা : ৩১ ডিসেম্বর ২০০৫; "*বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনীতিক অর্থনীতি*", জাহানারা ইমাম স্মারক বক্তৃতা ২০১২, ঢাকা: ২৬ জুন ২০১২; "*Political Economy of Fundamentalism in*

পরিবর্তন ঘটেছে যার ফলে এখানে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা এমন জঙ্গি রূপ নিচ্ছে– জোরদখল করতে চায় সবকিছু। কি সেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি যার উপর ভর করে ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িকতা পুষ্ট হচ্ছে? তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও জঙ্গি কর্মকাণ্ড সংগঠিত করার ভিত কত শক্ত, কত সুদৃঢ়? ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িক "জিহাদি আন্দোলন" কতদূর বিস্তৃত হবার ক্ষমতা রাখে– পারবে কি তা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে? তাদের সাথে আন্তর্জাতিক সশস্ত্র জিহাদিদের সম্পর্ক কী? এখন থেকে দশ বছর আগে মারাত্মক দৃশ্যমান ১৭ আগস্ট ২০০৫-এ "গায়ের জোরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরে" বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িকতা বিষয়টি আর নেহায়েত 'সমস্যা' পর্যায়ে নেই, তা উত্তরিত হয়েছে 'সংকটে'। গুণগত দিক থেকে সাম্প্রদায়িকতার উত্থানে এ এক নূতন পর্যায়। আর ১৯৭১-এর মানবতা বিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রমসহ শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চে প্রগতিবাদী তরুণ প্রজন্মের আলোকিত-আন্দোলন সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানকে আরো এক ধাপ চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে চ্যালেঞ্জটি তারা "হেফাজতে ইসলাম"-এর ব্যানারে গ্রহণ করে এবং পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কারণে তা উচ্চতর ও জটিলতর পর্যায়ে উত্তরিত হয়। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে সাম্প্রদায়িকতার অনগ্রসর-পশ্চাৎপদ দৃষ্টিভঙ্গি দেশকে হাজার বছর পিছিয়ে দিতে পারে। সাম্প্রদায়িকতা যুক্তির ধার ধারে না, অন্ধকারই তার যুক্তি-ভিত্তি। আর তাই দেশ বাঁচাতে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের গতি রোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের অর্জন ১৯৭২-এর মূল সংবিধানের চেতনায় জনকল্যাণকামী এক সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনাসমৃদ্ধ বাংলাদেশের জনগণের সুদৃঢ় ঐক্যভিত্তিক সুসংগঠিত সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক কর্মকাণ্ডের আর কোনো বিকল্প নেই। এসবের পাশাপাশি মনে রাখা জরুরী যে যেহেতু "অর্থনৈতিক শোষণ" আর "বৈশ্বিক রেন্ট সিকিং ব্যবস্থা" সবধরনের বিচ্ছিন্নতা (alienation) ও অসমতা (inequality) সৃষ্টির উৎস যা সবধরনের মৌলবাদ (ধর্মভিত্তিক, জাতিগোষ্ঠীভিত্তিক, বর্ণভিত্তিক ইত্যাদি) সৃষ্টি ও পুন:সৃষ্টির ক্ষেত্র উর্বর করে এবং যেহেতু ঐ শোষণ ব্যবস্থা (অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, রেন্ট-সিকার নিয়ন্ত্রিত) বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য ও প্রভুত্ব-এর অস্তিত্ব ও সম্প্রসারনের প্রধান শর্ত সেহেতু মানব প্রগতি রোধকারী এ লড়াইটা হতে হবে একই সাথে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং ধর্মীয় মৌলবাদ বিরোধী ঐক্যবদ্ধ লড়ায়। এ লড়ায় সৃজনশীল এক কর্মযজ্ঞ যে কর্মযজ্ঞে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও কালক্ষেপণ মহাবিপর্যয়ের কারণ হতে পারে।

Bangladesh", in *Mainstream,* Special Supplement on Bangladesh, New Delhi: Vol. L1, No 14, March 13, 2013; *"বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতি",* keynote paper presented at International Public Lecture organized by Bangladesh *Itihas Sammilani* "Religion and Politics: South Asia", Dhaka: 4-5 October 2013; "*Imperialism and Religious Fundamentalism: A Treatise on Political Economy with reference to Bangladesh*", keynote paper presented at International Seminar "Combating Fundamentalism and Imperialism in South Asia", Dhaka: 29 May 2015; "*A Political Economy Treatise on Religious Fundamentalism and Extremism: A high Probabrlity global catasirophe with reference to Bangladesh*", Lead Speaker's paper, IISS, London: 9 September 2015; "*বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি ও জঙ্গিবাদ: মর্মার্থ ও করণীয়*", মূল প্রবন্ধ, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত জাতীয় সেমিনার ২০১৫, ঢাকা: ১২ ডিসেম্বর ২০১৫; "*মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি বিচার প্রসঙ্গে*", দক্ষিণ এশিয়ায় মৌলবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও নারী-প্রতিরোধ শীর্ষক তৃতীয় দক্ষিণ এশীয় সম্মেলন ২০১৬-এর জন্য রচিত মূল প্রবন্ধ, ঢাকা: ১১ মার্চ ২০১৬।

১. ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ, মৌলবাদী জঙ্গিত্ব:প্রারম্ভ কথা

ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও ধর্মীয় জঙ্গিত্বের মর্মার্থ অনুধাবনে প্রথমেই দুটো বিষয় নিয়ে শুরু করা যথার্থ মনে করছি। বিষয় দুটি নিম্নরূপ: প্রথমত একদিকে বস্তুনিষ্ঠ গবেষকেরা বলছেন "বিশ্বে মোট ১৩০ কোটি মুসলমান। এদের মধ্যে ৭ শতাংশ অর্থাৎ ৯ কোটি ১০ লক্ষ রাজনৈতিকভাবে উগ্রপন্থি। এই উগ্রপন্থিরা যদি মনে করতে থাকেন যে তারা রাজনৈতিকভাবে পদদলিত, আগ্রাসনের শিকার, এবং অসম্মানিত সেক্ষেত্রে পশ্চিমাদের পক্ষে ওদের মন পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না"।[১] এতো গেলো ভয়াবহতার এক দিক। আর অন্যদিকে "সমস্যা সমাধানের দর্শন"(!) হিসেবে উগ্রবাদী জামাত-ই-ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা আবুল আলা মওদুদি বলছেন, "ইসলামের লক্ষ্য শুধুমাত্র কোনো একক দেশে অথবা একগুচ্ছ দেশে ইসলামি রাজ কায়েম করা নয়– ইসলামের লক্ষ্য হলো বিশ্বব্যাপী ইসলামি রাজ কায়েমের উদ্দেশ্যে বিপ্লব করা"।[২] ইসলাম ধর্মভিত্তিক মৌলবাদী জঙ্গিত্বের অন্যতম প্রবক্তা আবুল আল মওদুদির বিশ্বব্যাপি ইসলামি রাজ কায়েমে যুক্তিক্রম এরকম: "যেহেতু ইসলাম নিতান্ত সাধারণ কোন ধর্মমাত্র নয় ইসলাম হলো মানুষের জীবন পরিচালনের বৈপ্লবিক কর্মসূচি সেহেতু মুসলমানদের পবিত্র দায়িত্ব হলো এই বৈপ্লবিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিজেদের পুর্ণমাত্রায় নিয়োজিত করা। 'জিহাদ' হলো ঐ বিপ্লবী লড়ায়-সংগ্রাম যা ইসলামভিত্তিক রাজনৈতিক দলকে তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যার্জনে অনুশীলন করতে হবে। ইসলামের লক্ষ্য হলো ইসলামি রাজ কায়েম করা এবং ঐ রাজ প্রতিষ্ঠায় যে সব রাষ্ট্র বাধা দেবে তাদের সমূলে ধ্বংস করা"।[৩]

উপরে যা বললাম তারই নিরিখে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্ব প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের শুরুতেই 'ধর্ম' (religion) নিয়ে দ্বিবিভাজনমূলক (dichotomous) একটি প্রয়োজনীয় বিষয় উল্লেখ করা দরকার। ধারণাত্মক দ্বিবিভাজনটা নিম্নরূপ:

১. 'বিশ্বাস হিসেবে ধর্ম' (religion as faith) এবং 'মতাদর্শ হিসেবে ধর্ম' (religion as ideology) এক কথা নয়;
২. 'ধর্মপ্রাণ' ও 'ধর্মান্ধ' এক কথা নয়;
৩. 'ধর্ম বিশ্বাস' ও 'ধর্মীয় গোঁড়ামি' এক কথা নয়;
৪. 'ধার্মিক' ও 'ধর্মান্ধতা' এক কথা নয়;
৫. 'ধর্মভীরু' ও 'ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্নতা' এক কথা নয়;
৬. 'ধর্ম' (religion) এবং 'ধর্ম নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি' (perception of religion) এক কথা নয়;
৭. 'ধর্মপ্রবণ' ও 'ধর্মীয় কুসংস্কারপ্রবণ' এক কথা নয়।

---

১ জন এসপোসিটো ও ডালিয়া মোগাহেদ, ২০০৭, Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think. Based on Gallup's World Poll-the largest study of its kind. New York: Gallup Press.

২ বিস্তারিত দেখুন, হযরত মির্জা তাহয়ির আহমদ, ১৯৮৯, AHMAD, Hazrat Mirza Tahir. (1989). *Murder in the Name of* Allah (translated by Syed Barkat Ahmad). London: Lutterworth Press. (Author wrote in Chapter 5: The Moududian Law of Apostasy, "Maulana Maududi's desire for political power knew no bounds. The law of apostasy which he evolved was an extension of his distatorial and intolerant personality– it had nothing to do with Islam. Ahmed quoted Maududi's work: "In our domain we neither allow any Muslim to change his religion nor allow any other religion to propagate its faith", দেখুন পৃ: ৪৯).

৩ The Politics Book, 2013, London: Dorling Kindersley Limited, পৃ: ২৭৮

ধর্ম, ধার্মিক, ধর্মান্ধতার বহিঃপ্রকাশ এবং এসবের গূঢ় অর্থ নিয়ে আমাদের ভাবনা-চিন্তা-সিদ্ধান্ত স্পষ্টিকরণে উল্লিখিত দ্বিবিভাজনসমূহ নিয়ে আমাদের দেশের সামাজিক বিজ্ঞানী ও ভাষা বিজ্ঞানীদের রীতিমতো গবেষণা জরুরি। দ্বিবিভাজনের এ বিষয়টি ধারণাগত ও নীতিগত উভয় দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রথমত, প্রায়শই দ্বিবিভাজনের একটি অংশের সাথে অন্য অংশ সমার্থক মনে করা হয়, ফলে সিদ্ধান্ত হয় ভ্রান্ত। দ্বিতীয়ত, দ্বিবিভাজনের প্রথম অংশের দ্বিতীয় অংশে রূপান্তর সম্ভাবনা থাকলেও বিপরীত সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। তৃতীয়ত, একজন ধর্ম বিশ্বাসী মানুষ এসব দ্বিবিভাজনের কোন অংশে যাবেন তার সিদ্ধান্ত নির্ভর করে তিনি যে সমাজে বাস করেন ঐ সমাজে তার অবস্থা-অবস্থান, তার চিন্তা-ভাবনা থেকে শুরু করে বৈশ্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর।

"সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্ব"— এসব নিয়ে আরও এগুনোর আগে স্পষ্ট করা প্রয়োজন প্রত্যয় বা ধারণা হিসেবে (অর্থাৎ as category or concept) 'অ-সাম্প্রদায়িকতা' (secularism) ও 'ধর্ম-নিরপেক্ষতা' কি সমার্থক? উভয়েই কি একই অর্থ ধারণ করে? 'সেক্যুলারইজম' বা অসাম্প্রদায়িকতা প্রত্যয়টির উদ্ভব ইউরোপিয় রাষ্ট্র ও রাজনীতি দর্শনে যার সারবস্তু ধর্মনিরপেক্ষতাহীনতা অথবা ধর্ম-অনিরপেক্ষতা নয়। আমাদের দেশে 'অসাম্প্রদায়িকতা' ও 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে একই অর্থে দেখা হয়, সমার্থক মনে করা হয়। যেমন আমাদের সংবিধানের বাংলাভাষ্য সংস্করণে যত জায়গায় 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি আছে ইংরেজি তরজমায় ঠিক সেইসব জায়গায় লেখা হয়েছে 'সেক্যুলারইজম' (অর্থাৎ অসম্প্রদায়িকতা)। শুধু তাই নয়, 'কম্যুনালইজম' (communalism) তাহলে কি? কম্যুনালইজমের আভিধানিক অর্থ হলো "বিশেষত কোনো ধর্ম সম্প্রদায়ের উগ্র জাতীয় চেতনা, যা অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি দুর্ব্যবহার বা সহিংসতার জন্ম দেয়।" আমাদের দেশে "ধর্মভিত্তিক উগ্রতা' কি জাতীয় চেতনায় রূপ নিয়েছে? আমার মতে এসব বিভ্রান্তি শুধু ভাষাগত বিভ্রান্তিই নয় ধারণাত্মক সারমর্মগত ভ্রান্তিও। কারণ একজন মানুষ ধর্মের ভিত্তিতে (বা কারণে) সাম্প্রদায়িক হতে পারেন। আবার সাম্প্রদায়িক হতে হলে "প্রচলিত অর্থের ধর্ম" থাকতেই হবে একথা বিভ্রান্তিকর এবং ভুল। অনুরূপ, কেউ ধর্ম-নিরপেক্ষতাহীন হলে তাকে ধর্মের ব্যবহার করতেই হবে, আবার ধর্মপ্রাণ বা ধার্মিক হলেই যে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাহীন হবেন– এর কোনটিই স্বতঃসিদ্ধ নয়। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতা-অসাম্প্রদায়িকতা ধর্মনিরপেক্ষহীনতা-ধর্মনিরপেক্ষতা— এসব নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানী ও সামাজিক বিজ্ঞানীদের অনেক ভাবনা-চিন্তা করতে হবে।

সাম্প্রদায়িকতা-ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ-মৌলবাদী জঙ্গিত্বের স্বরূপ অনুধাবনে প্রথম বলা উচিত যে, ধর্মীয় মৌলবাদ হচ্ছে যুদ্ধংদেহী এক ধর্মপ্রীতি। এটা এমনই এক বিশ্বাস যা প্রতিনিয়ত আদর্শিক সংঘর্ষের জন্য তৈরি থাকার প্রেরণা যোগায়। বড় ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে এর অস্তিত্ব সুস্পষ্ট। খ্রিষ্ট ধর্ম, ইসলাম, ইহুদি, হিন্দু, বৌদ্ধ এমনকি কনফুসিয়াস অনুসারীদের কথা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। খ্রীষ্ট ধর্মের ক্ষেত্রে মতাদর্শের প্রভাব যতটা প্রবল ইসলাম বা ইহুদির বেলায় ততটা জোরালো নয়। সব ধর্মের মৌলবাদীরা নির্দিষ্ট এক ছকের অনুসারী। তারা আধ্যাত্মিকভাবে সংগ্রামের চেতনায় সদা প্রস্তুত। তাই ধর্মনিরপেক্ষ ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসীদের সাথে মৌলবাদের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। ধর্মভিত্তিক মৌলবাদীরা তাদের আদর্শগত এই সংগ্রাম-সংঘর্ষকে প্রচলিত রাজনৈতিক সংগ্রাম হিসেবে মূল্যায়ন করে না। বরং তাদের বিশ্বাস, এ যুদ্ধ হচ্ছে শুভ এবং অশুভ শক্তির মধ্যে দুনিয়াব্যাপী লড়াই। অস্তিত্ব হারানোর প্রচ্ছন্ন এক ভীতি মৌলবাদীদের প্রতিনিয়ত তাড়িত করে। এ অবস্থা থেকে মুক্ত থাকার জন্য প্রায়শ তারা সমাজের মূলধারা থেকে বেরিয়ে এসে নিজেরা বিকল্প এক চেতনার উদ্ভব ঘটায়। মনোনিবেশ করে আধুনিক যুক্তিগ্রাহ্যতার দিকে। তথাপি মৌলবাদীরা অবাস্তব কোনো ধ্যান ধারণার অনুসারী নয়। তারা তাদের মূল আদর্শকে

অনন্যসাধারণ গুণসম্পন্ন নেতৃবৃন্দের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নতুন মতাদর্শের সূচনা করে। তারা ধর্মীয় মৌলবাদী আদর্শে বিশ্বাসীদের জন্য মেলে ধরে কর্মপরিকল্পনা। মৌলবাদীরা তাদের ধর্মীয় পৌরাণিক কাহিনিকে সৃষ্টিকর্তার কর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সদা সচেষ্ট। এ উদ্দেশ্যে তারা জটিল সব পৌরাণিক কাহিনিকে সর্বজন উপযোগী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। আর এসব মতাদর্শ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হলে তাদের মধ্যে তৈরি হয় ক্ষোভ। তারা হয়ে ওঠে প্রতিহিংসা পরায়ণ।[৪]

প্রারম্ভিক এসব কথা বলার পরে উল্লেখ প্রয়োজন যে বক্ষ্যমান প্রবন্ধটিকে প্রবন্ধ বলবো না পুস্তিকা বলবো– এ নিয়ে সংশয়ে আছি। চেয়েছিলাম গত বিশ বছরের মৌলবাদের অর্থনীতি, রাজনৈতিক অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্ব নিয়ে আমার গবেষণাফল এবং তার সাথে অন্যদের যুক্তিতর্ক মিলিয়ে মোটামুটি ছোট-খাটো একটি নিবন্ধ রচনা করতে। শেষ পর্যন্ত ঐ অবস্থা থাকলো না। বিষয়ের যতোই ভেতরে ঢুকলাম ততোই নতুন নতুন মাত্রা আসতে থাকলো। যেমন "ধর্ম ও ব্রেইন" (neurotheology); আল-কায়েদার মহাপরিকল্পনা (বা মাস্টার প্ল্যান) আর তার সাথে আমাদের দেশের মৌলবাদী জঙ্গিত্বের সম্পর্কাদি; আমাদের দেশে মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠনসমূহের উত্তরণ পর্বসমূহ এবং সে সবের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। যা হোক শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে গেলো নয়-অনুচ্ছেদ বিশিষ্ট পুস্তিকা। অনুচ্ছেদসমূহের শিরোনাম স্ব-ব্যাখ্যায়িত। শিরোনামসমূহ নিম্নরূপ: ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ, মৌলবাদী জঙ্গিত্ব: প্রারম্ভ কথা (অনুচ্ছেদ ১), মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি ও জঙ্গিবাদ: অভ্যন্তরীণ ও সাম্রাজ্যবাদ-সংশ্লিষ্ট বহিঃস্থ কারণসমূহ (অনুচ্ছেদ ২), পূর্ব বাংলায় ইসলাম ধর্মের উদ্ভব: ঐতিহাসিকভাবেই উদারনৈতিক, মানবিক এবং অসাম্প্রদায়িক (অনুচ্ছেদ ৩), "উদারনৈতিক ইসলাম" থেকে "রাজনৈতিক ইসলাম": সমকালীন পশ্চাদমুখী রূপান্তর (অনুচ্ছেদ ৪), ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের অর্থনীতি: ভিত্তি, প্রকৃতি, মাত্রা (অনুচ্ছেদ ৫), মৌলবাদের অর্থনীতি: গঠন প্রক্রিয়া, বিস্তৃতি ও সম্ভাবনা (অনুচ্ছেদ ৬), মৌলবাদের অর্থনীতি, রাজনীতি ও জঙ্গিত্ব: যোগসূত্র কোথায়? (অনুচ্ছেদ ৭), "ধর্ম ও ব্রেইন": স্নায়ুতান্ত্রিক বা মনোজাগতিক ধর্ম দর্শন-এর যে বিষয়টি বোঝা জরুরি (অনুচ্ছেদ ৮), এবং মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের সম্ভাব্য "সীমানা": তাহলে করণীয়? (অনুচ্ছেদ ৯)।

২. মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি ও জঙ্গিবাদ: অভ্যন্তরীণ ও সাম্রাজ্যবাদ-সংশ্লিষ্ট বহিঃস্থ কারণ সমূহ

মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিবাদ সংশ্লিষ্ট সাহিত্যে তুলনামূলক নতুন ধারণা। মৌলবাদের অর্থনীতির কথায় ধরা যাক। "মৌলবাদের অর্থনীতি" ধারণাটি আসলে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির এক ঘনীভূত প্রকাশ (concentrated expression of religious communal politics)। মৌলবাদের অর্থনীতি অসাম্প্রদায়িক চেতনাবিরুদ্ধ। এক কথায় এ অর্থনীতি আমাদের মুক্তি-স্বাধীনতা উদ্ভূত ৭২'এর সংবিধানের মূল চেতনা বিরুদ্ধ। কোথা থেকে, কিভাবে, কেনো সৃষ্টি হলো মৌলবাদ ও তার অর্থনীতি? জনকল্যাণমুখী বিকাশ-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে ব্যর্থতা এবং অসাম্প্রদায়িক-গণতান্ত্রিক মানস কাঠামো সৃষ্টির ব্যর্থতা থেকেই পুষ্ট মৌলবাদ ও তার অর্থনীতি। এ ব্যর্থতাই মৌলবাদের অর্থনীতির উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের প্রধান ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এ ব্যর্থতাই ধর্মের নামে জোর জবরদস্তি করে রাষ্ট্রক্ষমতা

৪ সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, ২০০৬, "Economics of Fundamentalism and the Growth of Political Islam in Bangladesh" in *Social Science Review*, The Dhaka University Studies, Vol-23, No-2, Dec. 2006.

দখলে উদ্যত জঙ্গিবাদের সীমাহীন জঙ্গিত্বের প্রধান কারণ। যে জঙ্গিত্বের নৃশংস-অসভ্য বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখেছি ২০০৫-এ; এসবের উত্তরকালীন নবরূপ আমরা দেখেছি হেফাজতে ইসলামের নারী বিদ্বেষী ও প্রগতি বিরোধি ১৩ দফাসহ তাদের সকল কর্মকাণ্ডে; আর এখন আমরা প্রায়শই দেখছি বিভিন্ন পথ-পন্থা-পদ্ধতিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মুক্ত চিন্তার মানুষদের খুন-জখমসহ আন্তর্জাতিক জঙ্গিদের সাথে সম্পর্ক-উদ্ভূত নতুন নতুন কর্মকাণ্ড। এখন দেশিয় ও বৈশ্বিক অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে আপাত দৃষ্টিতে চূড়ান্ত বলে মনে হলেও ধর্মের নামে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলই হয়তোবা মৌলবাদী জঙ্গিত্বের শেষ কথা নয়; বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ীকরণই সম্ভবত চূড়ান্ত লক্ষ্য। আর ঐ চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর অন্যান্য অনেক পথ-পন্থা-পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম মাধ্যমই হলো ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও জঙ্গিত্ব।

গত শতাব্দির প্রথমার্ধে সমাজতন্ত্রের উত্থান আর শেষের দিকে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে ভাঙ্গন-পরিবর্তন, উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহে অর্থনৈতিক সংকট, সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী মনোভাবের স্পষ্ট প্রকাশ, পৃথিবীর এক মেরুয়ায়ন, আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া ও সিরিয়ার বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধ ও আগ্রাসন-জবরদখল, "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের" (War on Terror) নামে বিশ্বব্যাপী অপকর্ম, অন্যায়-অন্যায্য বিশ্বায়নের ডামাডোল– এসব কিছুই ভিন্ন ভিন্নভাবে এবং যৌথভাবে ধর্ম-ভিত্তিক মৌলবাদের উত্থানে গতি বৃদ্ধি করেছে। আবার একথাও বলা যৌক্তিক যে এসব করাও হয়েছে ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্ব পুষ্ট করার স্বার্থেই। মৌলবাদের উত্থান ত্বরান্বয়নে সাম্রাজ্যবাদ কোথাও প্রধান ভূমিকা পালন করেছে (যেমন, তালেবানইজম, মোল্লা ওমর, বিন লাদেন, আইএস কাদের সৃষ্টি?), আবার কোথাও স্বার্থ উদ্ধারের পরে তাদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আসলে এসবই শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত হয় মুনাফা সমীকরণ দিয়ে। আর এই মুনাফা সমীকরণের পিছনে আছে "হোতা সাম্রাজ্যবাদ" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পৃথিবীর চারটি মৌল-কৌশলিক সম্পদের উপর তাদের নিরঙ্কুশ মালিকানা (absolute ownership) ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রণ (absolute monopoly and control) প্রতিষ্ঠা করা। যে চার সম্পদ হলো: জমি সম্পদ, পানি সম্পদ, তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ, আকাশ-মহাকাশ সম্পদ। মূল কথাটি হলো সাম্রাজ্যবাদ কখন কোথায় কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে তা নির্ভর করছে তার নিজস্ব রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সমীকরণে স্বার্থ সংশ্লিষ্টতার ওপর– যেখানে শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক স্বার্থটিই প্রধান। কারণ ৩০০ শতাংশ মুনাফা প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকলে ফাঁসির সম্ভাবনা জেনেও এমন কোনো অপরাধ নেই যার ঝুঁকি "পুঁজি" নেবে না। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদের বিকাশের সাথে মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতার রাজনৈতিক-অর্থনীতির উত্থান ও বিকাশ যেমন সাযুজ্যপূর্ণ তেমনি সাম্রাজ্যবাদের অধিকতর বিকাশের স্বার্থে সুনির্দিষ্ট ধরনের মৌলবাদ বাধার কারণ হলে তা প্রতিস্থাপিত হবে অন্য রূপের সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে– এটাও লক্ষণীয়। মৌল-কৌশলিক সম্পদ– তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদের রাজনৈতিক অর্থনীতি, পানি সম্পদের ভৌগলিক অর্থনীতি, জমি-কৃষি-খাদ্য সম্পদের রাজনৈতিক অর্থনীতি, বিশ্ব বাজারে (তথাকথিত 'অবাধ বাজার' আর বিশ্বায়নের নামে) কর্তৃত্ব স্থাপনের রাজনৈতিক অর্থনীতি, আকাশ-মহাকাশ সম্পদের রাজনৈতিক অর্থনীতি– বর্তমান যুগের ঐতিহাসিক বাস্তবতায় এসবই মৌলবাদের সাথে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্টতার অন্যতম অনুষঙ্গ।

বহিঃস্থ ও অভ্যন্তরীণ উভয় উপাদানই ধর্মের উদারনৈতিকতার বিপরীতে সংকীর্ণতা বিকাশে ভূমিকা রাখে। একদিকে বিশ্ব অর্থনীতিতে সাম্রাজ্যবাদী ডলার অর্থনীতির বিপর্যয়[৫], বিশ্ববাজারে পেট্রোডলারের বাড়-বাড়ন্ত ও অস্থিরতা, সোভিয়েত ইউনিয়নের আফগানিস্তান আক্রমণ, ১১ সেপ্টেম্বরে টুইন টাওয়ার ভেঙ্গে ফেলা এবং পরবর্তীকালে "সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের" নামে সাম্রাজ্যবাদের অযৌক্তিক অতি-

[৫] জোসেফ স্টিগলিজ, ২০১৩, The Price of Inequaility, New York: Penguin Press. পৃ: ২-৩।

প্রতিক্রিয়া, "উন্নত" বিশ্বে মুসলমান নামধারীদের প্রতি প্রকাশ্য সন্দেহ-অবিশ্বাস, যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্যের বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল ভাণ্ডার সমৃদ্ধ দেশ ইরাক আক্রমণ ও দখল, তেল সমৃদ্ধ দেশ লিবিয়ায় আগ্রাসন ও দখল, সিরিয়া দখলের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, ইয়েমেনসহ মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার অনেক দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি, গোলাকায়নের গোলকধাঁধায় ইলেকট্রনিক মিডিয়ার অপসংস্কৃতি প্রচার, আর অন্যদিকে আমাদের দেশে 'রেন্ট-সিকার' নিয়ন্ত্রিত দুর্বৃত্তায়িত আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবেশে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর দুঃখ-দুর্দশা-বঞ্চনা-বিপন্নতা-অসমতা বৃদ্ধি, দৈনন্দিন জীবনে মানুষের ক্রমবর্ধমান অসহায়ত্ব এবং রাজনীতিতে গণতন্ত্র চর্চায় ঘাটতি– এসব কিছুই ধর্মের উদার ধ্যান-ধারণার বিপরীতে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাত্রায় অবদান রাখছে। এসবই সেসব সুযোগ সৃষ্টি করে যা ধর্ম-ভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির চাহিদা বৃদ্ধিতে সহায়ক, আর সে চাহিদা পূরণেই মৌলবাদী অর্থনীতি ও জঙ্গিত্বসহ সংশ্লিষ্ট রাজনীতির উদ্ভব বলা যায়। এ দু'টি একে অন্যের পরিপুরক– যৌথভাবে তাদের মুল লক্ষ্য আপাতত 'ধর্মের নামে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল', আর দীর্ঘমেয়াদে "বৈশ্বিক পুঁজিবাদ চিরস্থায়ীকরণ" (সঠিকভাবে বললে বলতে হয় "রেন্ট-সিকার নিয়ন্ত্রিত মুক্তবাজার অর্থনীতির বৈশ্বিক পুঁজিবাদ চিরস্থায়ীকরণের প্রচেষ্টা")।

ধর্মভিত্তিক মৌলবাদের সাথে সাম্রাজ্যবাদের যোগসূত্রের রাজনৈতিক অর্থনীতির মর্মার্থ অনুধাবনে ইতোমধ্যে উল্লিখিত অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দুটি বিষয় বিশেষ গুরুত্বসহ বিশ্লেষিত হওয়া জরুরি। বিষয় দুটি হলো: (১) "ডলার অর্থনীতির বিপর্যয়", এবং (২) "যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা"। বিষয় দুটি একটু খোলাসা করে বলা প্রয়োজন। ডলার অর্থনীতির বিপর্যয় বিষয়টি বহুমাত্রিক। অর্থনীতির ডলারাইজেশন ল্যাতিন আমেরিকা, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়ার বহু উন্নয়নশীল দেশকে সংকটাপন্ন করেছে। এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সবচে' ক্ষমতাধর কিন্তু সেইসাথে সবচে' দেনাগ্রস্ত দেশ। যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি তার রপ্তানির তুলনায় কয়েকগুণ বেশি। এ ফাঁক পূরণ করতে মার্কিন অর্থনীতিকে অতিমাত্রায় নির্ভর করতে হয় বিদেশি ঋণদাতাদের উপর। যুক্তরাষ্ট্রের এখন চলতি একাউন্ট ঘাটতি (current account deficit) হ'ল গড়ে বছরে ৫০০ বিলিয়ন ডলার। এ প্রক্রিয়ায় বিদেশি ঋণদাতাদের কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এখন পর্যন্ত মোট দেনার পরিমাণ দুই ট্রিলিয়ন (২০০০ বিলিয়ন) ডলার, যা তাদের জি ডি পি-র ২০ শতাংশ। বার্ষিক ৩ শতাংশ হারের সুদে মার্কিন অর্থনীতিকে এখনই বছরে গড়ে ২০০ বিলিয়ন ডলার দেনা পরিশোধ করতে হয়। এ হারে ঋণ-দেনা চলতে থাকলে ২০২০ সাল নাগাদ বিদেশি ঋণদাতাদের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের দেনার পরিমাণ দাঁড়াবে জিডিপি-র ৭০ শতাংশে। মার্কিন জনগণের উপর নূতন নূতন করারোপ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের বাজেট ঘাটতি বাড়তেই থাকবে। আবার সেটা করা হলে বাড়বে অস্থিরতা। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইতোমধ্যে বৈষম্য-অসমতা এমনই বেড়েছে যে এখন "সর্বোচ্চ ধনী ১ শতাংশের মালিকানা আছে দেশের মোট সম্পদের ৩৩ শতাংশ"[৬]। সুতরাং জোরপূর্বক অন্যের সম্পদ দখল করা ছাড়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সামনে দ্বিতীয় বিকল্প নেই; বিকল্প নেই সম্পদশালী দুর্বল দেশের সম্পদ জোরদখল ছাড়া এবং তা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যেই পরিণত হয়েছে বৈশ্বিক রেন্ট-সিকারদের নেতা।

যেহেতু মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট সন্ত্রাসী-জঙ্গিত্বের সাথে সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্কটি সরাসরি এবং যথেষ্ট মাত্রায় সংশয় সৃষ্টিকারী ও বিতর্কিত সেহেতু বিষয়টি যথামাত্রা বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এ নিয়ে সংশয়-বিভ্রান্তি-বিতর্ক যেসব কারণে হয় তার অন্যতম হলো এরকম: যদি আল-কায়েদা

[৬] বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, ২০১৫, বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ, পৃ: ১৮৩-২১২।

এবং/অথবা আইএস সাম্রাজ্যবাদেরই সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে সাম্রাজ্যবাদসহ পুঁজিবাদী দেশসমূহ কেনো 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের' নামে আল-কায়েদা ও আইএস-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে?

এ প্রবন্ধের যুক্তি-কাঠামোর সমর্থনে উপরের বিষয়টি একটু বিস্তারিত বিশ্লেষণের দাবি রাখে। এ বিষয়ে আমার বিশ্লেষণ নিম্নরূপ[৭]: অর্থনীতি ও রাজনীতির মারপ্যাচে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র "সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে" (imperialistic power) পরিণত হয়েছে গত শতকের (বিংশ শতকের) শুরুর দিকে– বলা চলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে। এবং তা অন্যতম সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিতে (imperialistic superpower) রূপান্তরিত হয়েছে গত শতকের মাঝামাঝি সময়ে– দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে (বলা চলে ১৯৪৫ পরবর্তীকালে যদিও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্ব আগ্রাসন পরিকল্পনা আরও অনেক আগে থেকেই শুরু), আর তা "একচ্ছত্র সাম্রাজ্যবাদী শক্তি" (monopolistic imperialistic power) অর্থাৎ "হোতা সাম্রাজ্যবাদে" (leader of imperialism) রূপান্তরিত হয়েছে গত শতকের ১৯৭০-১৯৮০-র দশকে (রূপান্তরের ঐ সময়কালটা সোভিয়েত ইউনিয়নে সামাজতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পতনের সময়কালের সাথে মোটামুটি মিলে যায়)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "হোতা সাম্রাজ্যবাদে" অর্থাৎ "সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বপ্রভু"-তে পরিণত হবার ইতিহাসটা খুব পুরানো নয়– এখন পর্যন্ত (২০১৫ সালে) বড় জোর ৩০-৪০ বছর। কিন্তু তার সাম্রাজ্যবাদের হোতা শক্তিতে রূপান্তরিত হবার স্বপ্নটি তুলনামূলক বেশ পুরানো– কমপক্ষে ১৯২ বছর– "মন্‌রো মতবাদ"[৮] (১৮২৩ সালের Monroe doctrine) দিয়ে যে স্বপ্নের শুরু। আর পরবর্তীকালে বিশ্বের আর্থ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে এবং ঐ পরিবর্তনে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে "কর্তব্য পালনে"(!) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের 'বিশ্ব প্রভুত্বের' সুপ্ত বাসনা বাস্তবে রূপান্তরিত করতে মন্‌রো মতবাদকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে মাত্র (just extension and expansion of Monroe doctrine)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বপ্রভু হবার সুপ্ত বাসনা ১৮২৩ সালের 'মন্‌রো মতবাদ' দিয়ে শুরু হয়ে সময়ের বিবর্তনে ২০০২ সালে ডিক চেনি-রোনাল্ড রামস্‌ফেল্ড-কলিন পাওয়েল রচিত মহাকৌশল (Grand Strategy)-এ রূপান্তরিত হয়েছে। এর আগে ১৮৪৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

---

[৭] বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, ২০১৫, বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ, পৃ: ১৮৩-২১২।

[৮] "মন্‌রো মতবাদ" ইতিহাসে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে আছে যে সাধারণ শব্দ অভিধানেও তা স্থান পেয়ে গেছে। শব্দ অভিধান লিখছে "মন্‌রো মতবাদ হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির অংশ যা বলছে যে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় স্ব-স্বার্থ রক্ষায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৎপর থাকবে।" আর উদ্ভব সূত্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই মতবাদটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জেমস মন্‌রো ১৮২৩ সালে তার দেশের ভবিষ্যত নীতি-কৌশল হিসেবে প্রদান করেন। যা ভবিষ্যত পররাষ্ট্র নীতির দৃঢ় ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত হয়। (দেখুন Oxford Advanced Learner's Dictionary, New 7th edition, পৃ: ৯৮৯)। ১৮২৩ সালের মন্‌রোর মতবাদকে বলা হয় ইউরোপিয় দেশসমূহ সম্পর্কে মার্কিন পররাষ্ট্র নীতি। মন্‌রো মতবাদের পটভূমি সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন। বিষয়সমূহ এরকম: (ক) নেপোলিয়নের যুদ্ধের (১৮০৩-১৮১৫) দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জেমস মন্‌রো তার মতবাদ বিনির্মাণে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন; (খ) মার্কিন সরকার ভয় পেয়েছিলো যে বিজয়ী ইউরোপিয় শক্তি আবারও জোরেশোরে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রচলন করতে পারে; (গ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভয় পেয়েছিলো যে ল্যাতিন আমেরিকার দেশসমূহে যখন ইউরোপিয় শাসনের পতন হল তখন স্পেন ও ফ্রান্স ল্যাতিন আমেরিকার দেশগুলোকে আবারও উপনিবেশে রূপান্তরিত না করে ফেলে; (ঘ) ফরাসিরা কিউবাকে হাতে পাবার বিনিময়ে স্পেনের রাজতন্ত্র পুনপ্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে; (ঙ) নেপোলিয়নের যুদ্ধের শেষে এশিয়া, আফ্রিকা ও রাশিয়া– রাজতন্ত্র রক্ষায় এক হয়ে "পবিত্র জোট" (Holy Alliance) গঠন করে। স্পেন ও স্পেনের উপনিবেশসমূহে "মদ্যপ শাসন" (Bourbon rule) কায়েমের জন্য এই 'পবিত্র জোটকে' সামরিক শক্তি প্রয়োগের অধিকার দেয়া হয় যখন স্পেনের উপনিবেশসমূহে স্বাধিকার আন্দোলন চলছে; (চ) রাশিয়ার জার সম্রাট আলাস্কার দক্ষিণে ওরিগণ ভূখণ্ডের দিকে

পশ্চিমমুখী সম্প্রসারণে আগ্রাসী হতে হবে বলে প্রণীত হলো 'ম্যানিফেষ্ট ডেসটিনি' ('গন্তব্যের ম্যানিফেষ্ট', Manifest Destiny)।

'ম্যানিফেস্ট ডেসটিনি' মতবাদে স্পষ্ট বলা হচ্ছে– "আমাদের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের) উত্তর আমেরিকা বিজয় এবং তার উপর কর্তৃত্ব-প্রভুত্ব ঈশ্বরের আদেশ"। 'ম্যানিফেস্ট ডেসটিনি'-তে বলা হচ্ছে যে, "রেড ইন্ডিয়ানদের উচ্ছেদ করা, তাদের জঙ্গল ও গরু-মহিষ-ষাড় ধ্বংস করা, জলাভূমি প্লাবিত করা, নদ-নদীর স্বেচ্ছাচারী ব্যবহার এবং শ্রম ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নিরবিচ্ছিন্ন শোষণ নির্ভর এক অর্থনীতি ব্যবস্থা গড়ে তোলা— এসব কিছুই মানুষের নয় ঈশ্বরের নির্দেশেই আমাদের করতে হবে"। 'ম্যানিফেস্ট ডেসটিনি'-তে ঈশ্বর প্রদত্ত এসব আদেশ নির্দেশের ভিত্তিতেই বলা হয়েছে যে গোলার্ধের সর্বত্রই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ অধিকার আছে, বিশেষত মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার যে কোন দেশ দখলের অধিকার আমাদের আছে। তবে যারা মার্কিন নীতির অনুগত হতে অস্বীকার করবে বা অবাধ্য হবে তাদের বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের আগ্রাসনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার আমাদের আছে। এরপর ১৮৮০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জেমস গ্যারফিল্ড ও প্রেসিডেন্ট বেঞ্জামিন হ্যারিসনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জেমস্ ব্লেইন ল্যাতিন আমেরিকার জাতিসমূহকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালন এবং মার্কিন ব্যবসায়ীদের জন্য লাতিন আমেরিকার বাজার উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে মন্‌রো মতবাদ সম্প্রসারণ করে "দাদাগিরি নীতি' (Big Brother Policy) প্রণয়ন করেন। এই নীতির ভিত্তিতেই মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী রিচার্ড ওলনেই ব্রিটেনকে এক সরকারি নোট দিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেন (২০ জুলাই ১৮৯৫) যে, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ মহাদেশে কার্যত সার্বভৌম। এই মহাদেশে আমাদের শাসন ক্ষমতা ও রায়ই চূড়ান্ত এবং এ ক্ষেত্রে আপত্তি উত্থাপনকারী বা ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী বলে কোন কিছুই থাকবে না"। ১৮৯৫-এর এসব ঘটনা এ্যাংলো-আমেরিকান সম্পর্কের ইতিহাসে, বিশেষত ল্যাতিন আমেরিকা নিয়ে অ্যাংলো-আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার (শত্রু-ভাবাপন্নতার) ইতিহাসে বিশেষ মুহূর্ত বলে বিবেচিত হয়। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সরকারি নোটের ভাষা তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড সালিসবারির কাছে আপত্তিকর মনে হওয়াতে ব্রিটিশ সরকার মন্‌রো মতবাদের পরিসর নিয়ে আলোচনার জন্য মার্কিন সরকারের কাছে প্রস্তাব দেন। মার্কিন সরকার আলোচনার এই প্রস্তাবটি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। যা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে "ব্রিটেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মন্‌রো মতবাদ ও গোলার্ধে মার্কিন আধিপত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে"।[৯] এর পরেই উনবিংশ শতকের শেষে আর বিংশ শতকের শুরুর দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যত বেশি বিশ্ব শক্তি-পরাশক্তিতে রূপান্তরিত হতে থাকে মন্‌রো মতবাদ ততবেশি আগ্রাসী হয়ে ওঠে। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন কুইনসি এডামস্ (প্রসিডেন্ট হবার আগে তিনি পররাষ্ট্র

শাসন-প্রসারিত করছে; (ছ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেমন একদিকে চায়নি যে "নয়া দুনিয়ায়" নতুন কোনো ইউরোপিয় উপনিবেশ হোক, অন্যদিকে চেয়েছিলো তাদের দক্ষিণে মার্কিনি বাণিজ্য প্রসারের বাধা অপসারিত হোক। এক্ষেত্রে গ্রেট ব্রিটেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একমত ছিল এ কারণে যে তারা চায়নি তারা ছাড়া ইউরোপের অন্য কোনো শক্তি নয়া দুনিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করে ব্রিটেনের শক্তি হ্রাস করুক (অবশ্য গ্রেট ব্রিটেনই তখন একমাত্র শক্তিধর যার নিয়ন্ত্রণে ছিল পৃথিবীর সবচে শক্তিশালী নৌ-শক্তি, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছিল না); (জ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনের সরকার যখন মন্‌রো মতবাদের মূল বিষয়– "নয়া দুনিয়া থেকে পুরাতন দুনিয়াকে ভিন্ন আঙ্গিকে দেখা"র বিষয়ে নীতিগতভাবে যৌথ স্বাক্ষরে সম্মত হয় তখন (১৮২৯ সালে) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জানতে পারে যে বৃটেনের বেশ কিছু সমুদ্র-বাণিজ্য ব্যবসায়ী টেক্সাস (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের) দখলের উদ্দেশ্যে গ্রেটব্রিটেনের সহায়তায় মেক্সিকোর সাথে ৫ লক্ষ ডলারের চুক্তি সম্পাদন করেছে। এর ফলে শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জেমস মন্‌রোর প্রশাসন এককভাবে "মন্‌রো মতবাদ" নিয়ে বিবৃতি প্রদান করে।

৯ জর্জ হেরিং, ২০০৮, From Colony to Superpower. U.S. Foreign Relations Since 1776. New York: Oxford University Press. পৃঃ ৩০৭-৩০৮।

মন্ত্রী ছিলেন) মন্‌রো মতবাদের ভিত্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশবাদ বিরোধী ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করেন, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জবিহীন কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করার পরিকল্পনার প্রথম ধাপ।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার আগে থিওডর রুজভেল্ট ১৮৯৮ সালে মন্‌রো মতবাদের ভিত্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক স্পেনের উপনিবেশ কিউবা দখলের পক্ষে যুক্তি দেন। ১৯০৪ সালে ইউরোপের পাওনাদাররা ল্যাতিন আমেরিকার দেনাদার দেশগুলোকে দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে দেনা আদায়ে সামরিক আক্রমণের ভয় দেখাতে থাকে। এ অবস্থায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিওডর রুজভেল্ট মন্‌রো মতবাদকে অধিকতর আগ্রাসী সম্প্রসারণের মাধ্যমে (যা "রুজভেল্ট অনুসিদ্ধান্ত" হিসেবে পরিচিত) ঘোষণা দেন যে "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি মনে করে যে ব্রিটেন ল্যাতিন আমেরিকার যে কোন দেশে হস্তক্ষেপ করতে পারে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি মনে করে যে ল্যাতিন আমেরিকায় কোন গর্হিত ও কঠিন ধরনের অন্যায় হচ্ছে সে ক্ষেত্রে তা রোধে মার্কিন সরকার আন্তর্জাতিক পুলিশি ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।" প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট-এর এ অনুসিদ্ধান্ত অনুসরণ করে ইউরোপিয়দের ক্ষমতাহীন করার লক্ষ্যে ১৯০৪ সালে সান্টো ডোমিংগোতে, ১৯১১ সালে নিকারাগুয়াতে এবং ১৯১৫ সালে হাইতিতে মার্কিন নৌবাহিনী পাঠানো হয়। এ ভাবেই বিংশ শতকের শুরুর দিকে 'মন্‌রো মতবাদ' ও 'ম্যানিফেস্ট ডেসটিনির' ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট থিওডর রুজভেল্ট প্রণীত অনুসিদ্ধান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিক আগ্রাসী শক্তি দিয়ে মার্কিন গোলার্ধের একক কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রণের "মহাদেশিয় পুলিশম্যানে" ('Hemispheric Policeman') রূপান্তরিত করে। এই প্রক্রিয়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নাগাদ (১৯৩৯ সাল) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী তার সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য বিস্তারের পথ-পদ্ধতি খুঁজতে থাকে। এতকাল ল্যাতিন আমেরিকা নিয়ে ব্যস্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর ল্যাতিন আমেরিকায় সীমাবদ্ধ না থেকে মন্‌রো মতবাদের মধ্যে যে বিশ্বপ্রভুত্বের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল তা বাস্তবায়নে এগিয়ে যায়। এ লক্ষ্যে ১৯৪৫ সালে (মে মাসে) মার্কিন যুদ্ধমন্ত্রী হেনরি স্টিমসন্ ধারণা দিলেন যে অন্য যে কোন পরাশক্তি বিশেষত ব্রিটেন যে সব আঞ্চলিক সিস্টেমে নিয়ামক ভূমিকা পালন করছে তা উচ্ছেদ করে সেইসব জায়গায় আমাদের বসতে হবে; ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন যে সব আঞ্চলিক জোটে নেতৃত্ব দিচ্ছে তা ভেঙ্গে ফেলতে হবে এবং সেখানে আমাদের পক্ষীয় আঞ্চলিক জোট সৃষ্টি করতে হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়েই (১৯৩৯-১৯৪৫) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কাউন্সিল (Council on Foreign Relations)-এর অন্যতম "যুদ্ধ ও শান্তি স্টাডি প্রজেক্ট" (War and Peace Studies Project) পরিচালন করে যেখানে থেকেই যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একচ্ছত্র প্রভুত্ব নিশ্চিত করার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এ প্রজেক্ট ১৯৪০-এর প্রথম দিকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক আধিপত্যের পরিকল্পনা উপস্থাপন করে যেখানে তারা হিসেবপত্তর কষে দেখালো যে তাদের ফরমুলা বাস্তবায়ন করতে পারলে ১৯৭০ এর প্রথম দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র "বিশ্ব সিস্টেমে একক আধিপত্যবাদী প্রভুত্ব করতে সক্ষম হবে"। তারা এই ফরমুলার নাম দিলো "গ্রান্ড এরিয়া কনসেপ্ট " (Grand Area Concept)। গ্রান্ড এরিয়া কনসেপ্ট-এর মূল কথা এরকম: "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির স্বার্থরক্ষাকারী অধীনস্থ অঞ্চল", যে অঞ্চল "বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের জন্য কৌশলগতভাবে প্রয়োজন" এবং যে অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হবে "পশ্চিম গোলার্ধ, দূরপ্রাচ্য, প্রাক্তন বৃটিশ উপনিবেশসমূহ"। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে না হতেই বোঝা গেলো যে পশ্চিম ইউরোপ এবং তেল সম্পদে সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্য (যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল ফ্রান্স ও ব্রিটেন) "গ্রান্ড এরিয়া" পরিকল্পনায় যোগ দেবে। 'গ্রান্ড এরিয়া' পরিকল্পনাবিশারদসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় প্রতিরক্ষা কাউন্সিল (National

Security Council) বুঝেছিল যে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাঁধা হবে সেইসব দেশ (ও মতাদর্শ) যেখানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং/অথবা যারা সমাজতন্ত্রী সমাজব্যবস্থা গঠনের পথে এবং/অথবা যেখানে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের উত্থান হচ্ছে এবং/অথবা যেখানে এমন ধরনের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব বিকশিত হচ্ছে যার প্রগতিবাদী রূপান্তর ঘটতে পারে এবং/অথবা যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুগত নয়, অবাধ্য।

১৯৬২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন কিউবায় মিসাইল ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপনা শুরু করলো তখন আবারও মন্‌রো মতবাদ প্রয়োগ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি কিউবার আশেপাশের দ্বীপসমূহে নৌঘাটি ও বিমানবহর সমাগম করে বললেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত কিউবায় নেতৃত্ব উচ্ছেদ না হচ্ছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার পরিবর্তন (regime change) না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত মহাসন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালানো হবে"।[১০] শেষ পর্যন্ত সমস্যার সুরাহা হল এরকম: সোভিয়েত ইউনিয়ন মিসাইল ক্ষেপণাস্ত্র উঠিয়ে নিল এবং স্থাপনা ধ্বংস করলো আর বিনিময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তুরস্ক থেকে তাদের অকেজো মিসাইল ও অকার্যকর স্থাপনা ধ্বংস করলো। রাষ্ট্রপরিচালনব্যবস্থায় প্রজ্ঞাবান উদারপন্থি ডিন অ্যাচেসন কিউবার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনের সমর্থনে ১৯৬৩ সালে বললেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবার সরকার পরিবর্তনের লক্ষ্যে যে বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদী ক্যাম্পেইন করেছে সেটা ন্যায়সঙ্গত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা, অবস্থান, ও মান-সম্মানকে (power, position, and prestige) যেই চ্যালেঞ্জ করুক না কেনো তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার মধ্যে কোন আইনগত বিষয় নেই"।[১১] ডিন এ্যাচেসন-এর তাত্ত্বিক নেতৃত্বে ১৯৬০-এর দশক থেকে শুরু হল মন্‌রো মতবাদের আগ্রাসী রূপান্তর, যার মূল কথা এরকম: "পঁচা আপেল ধ্বংস করো"; "আমরা ওদেরকে আমাদের শর্তে "শান্তি" দেবো, আর ওরা তা প্রত্যাখ্যান করলে– তা হবে গোরস্থানের বিজয়"; "ডোমিনো তত্ত্ব প্রয়োগ করো"। মন্‌রো মতবাদের নবতর এই রূপ দেখা গেলো ভিয়েতনাম যুদ্ধে (১৯৬২ সাল থেকে)। এ প্রসঙ্গে ইতোমধ্যে ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় প্রতিরক্ষা দফতরের গোপন নথিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল যে ইন্দোচীনের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রথমে ইন্দোচীনে ফরাসি যোদ্ধাদের সমর্থন করতে হবে, ঐ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হবে। আর পরে ফরাসিদের সরিয়ে ইন্দোচীন বিরোধী যুদ্ধকে নিজেদের হাতে তুলে নিতে হবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা অনেক আগেই ভিয়েতনামে প্রাকৃতিক সম্পদের কথা তুলেছিলেন, কিন্তু পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইন্দোচীন দখলের যুদ্ধ সম্পদের জন্য করেনি। এটাও 'মন্‌রো মতবাদ'সহ ম্যানিফেষ্ট ডেসটিনি, 'গ্রান্ড এরিয়া' পরিকল্পনা ও ডিন অ্যাচেসনের নীতি-তত্ত্বের সাথে সাযুজ্য রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যবাদকে বিশ্বপ্রভুত্বে রূপান্তরের যুদ্ধ।

'বিশ্ব-প্রভুত্বে' রূপান্তরের উল্লেখিত নীতি-তত্ত্ব প্রয়োগ করেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসন ভিয়েতনামে মহাআগ্রাসী যুদ্ধ করেছেন,[১২] প্রেসিডেন্ট নিক্সন কম্বোডিয়া আক্রমণ করেছেন, প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ৯/১১ দেখিয়ে ইরাক দখল করেছেন, প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগান আবিষ্কার করেছেন "সন্ত্রাসের

---

[১০] নোয়াম চমস্কি, ২০০২, Reflections on 9/11, in The Essential Chomsky (Arnove Anthony, New Delhi: Penguin Books India, 2008, পৃ: ৩৪৩।

[১১] এসব "অ্যাচেসন মতবাদ" (Acheson doctrine) হিসেবে খ্যাত। বিস্তারিত দেখুন, নোয়াম চমস্কি, ২০০৪, Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance, Penguin Books, পৃ: ১৪-১৬।

[১২] এখানে উল্লেখ জরুরি যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভিয়েতনাম যুদ্ধে যত গোলাবারুদ ব্যয় করেছে (ordnance expended) তার পরিমাণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি ও ইতালিতে সম্মিলিতভাবে যত গোলাবারুদ ব্যবহার করা হয়েছে তার চেয়ে বেশি হবে [এ তথ্যটি মার্কিন কংগ্রেসে ভিয়েতনাম যুদ্ধ সম্পর্কে সিনেটর ম্যানস্‌ফেল্ড তার সাক্ষ্য প্রমাণে বলেছেন; দেখুন চমস্কি, ১৯৬৭, "On Resistance", in The Essential Chomsky (Arnove Anthony, ed.) New Delhi: Penguin Books India, 2008, পৃ: ৬৫]।

বিরুদ্ধে যুদ্ধের" (War on terror) ফরমুলা, প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা মহাকাশের সামরিকীকরণে মার্কিন কংগ্রেস থেকে সমর্থনসহ সর্বোচ্চ পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ আদায় করে ছেড়েছেন। এসব কিছুই করা হয়েছে সুনির্দিষ্ট একক লক্ষ্যে। লক্ষ্যটি হল "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে একচ্ছত্র-অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্ব প্রভুতে রূপান্তরিত করতে হবে।"

১৯৬০-এর দিকে নবরূপে শুরু "ডোমিনো তত্ত্বের" যে ভাষ্যটি (এ তত্ত্বের দুটো ভাষ্য আছে) প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসন ভিয়েতনামে যুদ্ধ করার যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করলেন তা বেশ স্থুল; যে ভাষ্যমতে "জনগণকে (নিজের দেশসহ যে কোনো দেশের) ভয় দেখাতে হবে যে ওরা (সে যে দেশই হোক অথবা যে দেশ যখন দরকার) যে বাড় বেড়েছে তাতে ওদের বিরুদ্ধে দ্রুত সমুচিত ব্যবস্থা না নিলে ওরা দ্রুতই ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে আসবে এবং আমাদের যা কিছু আছে (যা ওদের নেই) তা ওরা দখল করে ফেলবে। "ওরা" বলতে প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসন শুধুমাত্র ভিয়েতনামকেই বোঝান নি, বুঝিয়েছিলেন ইন্দোচীনের সবাইকে; আর ওদের নাম দিয়েছিলেন "হলুদ বামন" ("yellow dwarves"!)। ডোমিনো তত্ত্বের 'যৌক্তিক'(!) ভাষ্য অথবা "অপারেটিভ ভাষ্য"-কে বলা হয় "পঁচা আপেল তত্ত্ব" (মার্কিন নীতি-কৌশল নির্ধারণকারী পরিকল্পকদের গোপন নথিপত্রে এটা Rotten Apple Theory বলে পরিচিত)। তত্ত্বটি এরকম: "এক বস্তা আপেল আছে, সব আপেলই 'ভাল' তবে একটা আপেল 'পঁচা'। ঐ পঁচা আপেল বস্তায় রাখা হলে ভাল আপেলগুলি পঁচে যাবে। সুতরাং ভাল আপেলগুলো ঠিকঠাক রাখতে হলে পঁচা আপেল ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে"। আর এই তত্ত্বের নিহিতার্থ হলো এরকম: 'ভাল' আপেল মানে সে সব দেশ-রাষ্ট্র যারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুগত ও সদা-বাধ্য; আর 'পঁচা' আপেল মানে সে সব দেশ-রাষ্ট্র যারা নিজ দেশে জাতীয়তাবাদী অথবা বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী অথবা সমাজতান্ত্রিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং সঙ্গত কারণেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুগত নয় এবং অবাধ্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পুরো উনবিংশ শতকে ল্যাতিন আমেরিকার প্রায় সকল দেশ, বিংশ শতকের প্রথমার্ধে ল্যাতিন আমেরিকাসহ দূরপ্রাচ্যের জাপান-কমুনিষ্ট চীন-ইন্দোচীন-দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া-দক্ষিণ এশিয়া-মধ্যপ্রাচ্য, বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসবসহ আফ্রিকা মহাদেশ আর ১৯৬০ এর দশকের ভিয়েতনাম-লাওস-কম্বোডিয়া-কিউবা, ১৯৭০-৮০-র দশকে আল সালভাদর-চিলি-বাংলাদেশ-নিকারাগুয়া, ১৯৯০-২০০০-এর দশকে ইরাক-লিবিয়া এসবই "পঁচা আপেল", মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের সন্দেহপ্রবণ দৃষ্টিতে 'আনুগত্যহীন'-'অবাধ্য'! উল্লেখ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই (১৯৪৭এর ফেব্রুয়ারি মাসে) এই "পঁচা আপেল" তত্ত্বের ভিত্তিতেই ডিন অ্যাচেসন্ মার্কিন কংগ্রেসকে প্রেসিডেন্ট ট্রুমান-এর মতবাদ বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে গ্রিস, তুরস্ক ও ইরানের উপর সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন চাপ প্রয়োগ করবে; প্রথম "পঁচা আপেল" হবে গ্রিস যা 'ইরানসহ' পূর্বদিকে যারা আছে সবাইকে "পঁচাবে", তারপরে এই পচন সংক্রমিত করবে এশিয়া মাইনরসহ, মিসর ও আফ্রিকায়, তারপরে পচন শুরু হবে সেইসব দেশে যে সব দেশে গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে কমুনিষ্টরা উপস্থিত অর্থাৎ ইতালি ও ফ্রান্সে। এ তত্ত্বে কাজ হয়েছে। ১৮২৩ সালে মন্‌রো মতবাদ দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের-সাম্রাজ্যবাদী মহা-প্রভু হবার যে স্বপ্নযাত্রা শুরু তা বিবর্তিত ও সম্প্রসারিত হয়ে ২০০২ সালে ডিক চেনি-রোনাল্ড র‍্যামসফেল্ড-কলিন পাওয়েলের হাতে বিশ্ব সম্পদে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একচ্ছত্র মালিকানা ও নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণের মহা-কৌশল বা Grand Strategy দিয়ে আপাতত শেষ (এ সম্পর্কে পরে আসছি)।

সমাজতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সিস্টেম যখন পরাশক্তি হিসেবে অনুপস্থিত, যখন মানব মুক্তির আন্দোলন-সংগ্রাম মন্থর অথবা নির্জীব, যখন দেশে-দেশে সার্বভৌমত্বও বিপর্যস্ত, যখন 'ভাল' আপেলের জয়-জয়াকার, যখন তথাকথিত বিশ্বায়নের ডামাডোলে তুলনামূলক স্বাধীন দেশও প্রকৃত অর্থে

পরাধীন– এহেন পরিবর্তিত পৃথিবীতে "বিশ্বপ্রভু" মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তাদের মহা নীতি-কৌশল (Grand Strategy) হিসেবেই চাইবে পৃথিবীর চারটি মৌল-কৌশলিক সম্পদের (fundamental strategic resources) উপর নিরঙ্কুশ মালিকানা (absolute ownership) এবং একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ কর্তৃত্ব (absolutely unilateral control) প্রতিষ্ঠা করতে। এ চার সম্পদ হল (১) জমি সম্পদ (land resources which is not product of labor), (২) পানি সম্পদ (water resources), (৩) জ্বালানি, শক্তি ও খনিজ সম্পদ (fuel, energy, mineral resources), এবং (৪) মহাশূন্য-মহাকাশ (space)। পৃথিবীর এই চার মৌল-কৌশলিক সম্পদে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের প্রশ্নে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কারও সাথে কোন ধরনের আপোষ করবে না (মাঝে মধ্যে সাময়িক "কূটনৈতিক আপোষ" ব্যতীত)। এটাকে বলা চলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের "Imperial Grand Strategy"– "সাম্রাজ্য বিস্তারের মহাকৌশল"। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তাদের সাম্রাজ্যবিস্তারের এই মহাকৌশল চালিয়ে যাবে আর তাদের অধীনস্থ উপ-সাম্রাজ্যবাদ, ধনী পুঁজিবাদী দেশসমূহ, সদ্য জন্মপ্রাপ্ত পুঁজিবাদী দেশসহ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল-স্বল্পোন্নত দরিদ্র দেশসমূহ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঐ মহাকৌশল নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে সহায়তা করবে অথবা করতে বাধ্য হবে। অবাধ্য হবার শাস্তি হবে চরম, যা ইতোমধ্যে কুৎসিতভাবে-বীভৎসভাবে প্রদর্শিত হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন 'অবাধ্য' দেশে। সাম্রাজ্য-বিস্তার ও "আমরাই বিশ্ব প্রভু"- এ নীতি বাস্তবায়নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর বিভিন্ন "অবাধ্য" দেশে "যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলার" নামে যা করেছে তার কিছু নমুনা নিম্নরূপ:

১. ১৯৬০-এর দশকে সমাজতান্ত্রিক কিউবার বিরুদ্ধে কিউবান মিসাইল ক্রাইসিস এর সময় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের "ক্ষমতা পরিবর্তনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড" পরিচালন (International terrorist campaign aimed at "regime change")। উল্লেখ্য যে 'সমাজতন্ত্র' ঐ সময়ে পৃথিবীতে পরাশক্তি হিসেবে উপস্থিত।

২. ১৯৮০-র দশকের শুরুর দিকে সান্দিনিস্ট বিদ্রোহীরা যখন নিকারাগুয়ায় মার্কিন আজ্ঞাবাহী পুতুল সরকার স্বৈরাচারী সামোজাকে উৎখাত করলো তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করলো। আন্তর্জাতিক আদালতসহ জাতিসংঘের বিচারেই এ ছিল মার্কিনিদের "আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ"।

৩. ১৯৮০-র দশকের মধ্যভাগে আল-সালভাদরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্বরতম হত্যাযজ্ঞ চালায়। এসব কারণেই গুয়াতেমালার প্রখ্যাত সাংবাদিক জুলিও গোডোই লিখেছেন "১৯৬০ থেকে ১৯৯০-র দশকে মধ্য-আমেরিকায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট রেগান আবিষ্কৃত "সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" (War on Terror)-এর নামে নিজেরাই যে বীভৎস আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড চালিয়েছে সে জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউস অতি সহজেই 'বিশ্ব নিষ্ঠুরতা পুরস্কারে' ভূষিত হতে পারে"।[১৩]

৪. মর্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০০২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে সব কারণ দেখিয়ে যে ভাবে ইরাক দখল করে তা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী "যুদ্ধাপরাধ" (War crime)। কারণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র-সরকার ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

[১৩] সোডাই, জুলিও (১৯৯০), Latin American Documentation (LADOC), *Torture in Latin America, (Lima, Peru), 1987. Nation,* 5 March, 1990

ঘোষণার ক্ষেত্রে মার্কিন জনমত উপেক্ষা করে (মার্কিন জনগণের ৯০ শতাংশ ইরাক দখলের বিপক্ষে ছিলেন)। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তাদের মহা-কৌশল (Grand new strategy)-এর অংশ "Doctrine of resort to force at will" অবলম্বন করে ইরাক দখলের পক্ষে যে সব যুক্তির আশ্রয় নেয় তা হলো: সাদ্দাম হোসেন একজন ডিক্টেটর; সাদ্দাম হোসেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক আসন্ন হুমকি; সাদ্দাম হোসেন টুইন টাওয়ার ভাঙ্গাসহ ৯/১১-এর জন্য দায়ী; সাদ্দাম হোসেন ৯/১১ মত আরও ক্ষতির সম্ভাব্য কুশীলব; এবং সাদ্দাম হোসেনের হাতে "গণবিধ্বংসী সমরাস্ত্র" (Weapon of mass destruction, WMD) আছে যা সে যে কোনো সময় ব্যবহার করবে (অবশ্য ইরাক দখলের পরে অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও ইরাকে "গণ-বিধ্বংসী মারণাস্ত্র" যখন পাওয়া গেল না তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বললো "কিছু যন্ত্রপাতি-যন্ত্রাংশ-মালামাল পাওয়া গেছে যা দিয়ে এ ধরনের মারণাস্ত্র-সমরাস্ত্র বানানো সম্ভব)। সাম্রাজ্যবাদের জন্য "সময়" ("time") বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইরাক দখলের সময়কালটা হলো মার্কিন কংগ্রেসের মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচন, যখন মার্কিন জনগণের মন-মানসিকতা মূল ঘটনা থেকে অন্যদিকে শিফ্‌ট করার প্রয়োজন ছিলো। তাহলে ইরাক দখল করতে হলো কেনো? একই সঙ্গে অনেক কারণে– এক ঢিলে অনেক পাখি মারার মতো। যার মধ্যে অন্যতম হলো বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল সমৃদ্ধ দেশ দখল; মধ্যপ্রাচ্যে ইরাকের ভৌগলিক-রাজনৈতিক গুরুত্ব যেখানে ভৌগলিকভাবে ইরাককে কেন্দ্র ধরলে তার চারপাশের সীমানা রাষ্ট্র হলো তেলসমৃদ্ধ ইরান, তুরস্ক, সিরিয়া, জর্ডান, সৌদি আরব ও কুয়েত আর সেই সাথে আছে পারস্য বা আরব সাগর– লোহিত সাগর-কৃষ্ণ সাগর-কাসপিয়ান সাগরকেন্দ্রিক জল-রাজনীতি;[১৪] ইরাকের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত দুই নদী-ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে সুপেয় পানির প্রধান উৎস; এবং ইরাক যুদ্ধে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে মহা-পুনর্গঠনের মহা-ঠিকাদার হবে মার্কিনি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ ইত্যাদি।

মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্বের উত্থানের সাথে সাম্রাজ্যবাদের যোগসূত্র নিরূপণে সন্ত্রাস দমনের নামে "যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা" নিয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ জরুরি যে যুদ্ধ ঘোষণা করে ইরাক দখল অনেক কারণেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজন ছিল। উপরে যা বলেছি তার সাথে আরও কয়েকটি বিষয় যোগ না করলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত স্বরূপ বোঝা যাবে না এবং তা না বোঝা গেলে এও বোঝা যাবে না যে সাম্রাজ্যবাদের আজকের যুগে আমাদের মতো দেশে কেনো বৈষম্যহীন ও অসাম্প্রদায়িক মুক্ত-স্বাধীন কাঠামো গড়ে তোলা যাবে না। বিষয়টি এরকম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সবচে ক্ষমতাধর কিন্তু একইসাথে সবচে দেনাগ্রস্ত দেশ। দাতাদের কাছে যুক্তরাষ্টের দেনার পরিমাণ তাদের জিডিপি-র ৭৩-৭৫ শতাংশ। মার্কিন জনগণের উপর নূতন নূতন করারোপ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের বাজেট ঘাটতি বাড়তেই থাকবে। আবার সেটা করা হলে বাড়বে অস্থিরতা। সুতরাং জোরপূর্বক অন্যের সম্পদ দখল করা ছাড়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সামনে দ্বিতীয় বিকল্প নেই। সুতরাং বাধাতে হবে যুদ্ধ, অন্যায় যুদ্ধ। যুদ্ধ– যুক্তরাষ্ট্রের জন্য প্রচণ্ড লাভজনক ব্যবসা। তা না হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একাই যে পরিমাণ সামরিক ব্যয় করে (বছরে ৩৭৫

[১৪] মনে রাখা জরুরি যে পৃথিবীর প্রাথমিক জ্বালানি সম্পদের বড় অংশটিই আছে উত্তর পারস্য সাগর (যে সাগরকে আরব দেশের মানুষ আরব সাগর নামে ডাকতে পছন্দ করেন)-এর আশেপাশের দেশগুলিতে, যে দেশগুলি প্রধানত মুসলিম শিয়া সম্প্রদায় অধ্যুষিত, যাদেরকে পশ্চিমা সাম্রাজ্য-পরিকল্পনাকারীরা ভয় পান।

বিলিয়ন ডলার) সারা বিশ্ব সম্মিলিতভাবেও সে পরিমাণ করে না কেন? অর্থনীতিবিদ নর্ডহাউস সাহেব যতই অংক কষে বলুক না কেন যে ইরাক যুদ্ধে ২০০ বিলিয়ন থেকে ৩,০০০ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত ক্ষতি হতে পারে– আসলে এ ক্ষতি সে ক্ষতি নয়। অবশ্য নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডম্যান সাহেব ফর্দ দিয়েছেন– এ যুদ্ধে লাভ হবে, বিশ্ব বাজার চাঙ্গা হবে। ইরাক দখলের পর থেকে প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধাস্ত্র বিক্রি হচ্ছে; যুদ্ধ পরবর্তী ইরাক পুনর্গঠনের ব্যবসা ইতোমধ্যে জমে উঠেছে; ব্যবসা করছে সব সাম্রাজ্যবাদ, সাথে থাকছে বিশ্বব্যাংক, আই এম এফ, ভাগ পাচ্ছে জাতিসংঘ। সাধারণত: বড় ধরণের যুদ্ধের পরে তৃতীয় বিশ্বেও যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবসা নূতনভাবে জমজমাট হয়, সেটাও হচ্ছে, আর কোথাও না হোক রাজতন্ত্রীয় ও (বুশের ভাষায়) 'ভাল' স্বৈরতান্ত্রিক দেশসমূহে। মনে রাখতে হবে যে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের অধিকাংশই তেলের ক্ষেত্রে চরম বিদেশ-নির্ভর; আর মধ্য-এশিয়ার তেল, আফগানিস্তানের তেলপথ, ইরাকের তেল, লিবিয়ার তেল– এসবই তেলের ভূগোলের সর্বশ্রেষ্ঠ রুট। ইরাকে তেল যুদ্ধের মূলে কাজ করেছে বিশ্বে যেখানে যে তেল সম্পদ আছে তার উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ মালিকানা (not access but ownership) প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। তেল সম্পদের দিক থেকে ইরাকের অবস্থান বিশ্বে শুধু দ্বিতীয় বৃহত্তমই নয় ইরাকের তেল আহরণ অপেক্ষাকৃত সহজ এবং সস্তাও বটে। যুক্তরাষ্ট্র অনুধাবন করতে পেরেছে যে, ইরাককে নিয়ন্ত্রণ করার অর্থই হচ্ছে তেলের মূল্য নির্ধারণে OPEC-এর উপর খবরদারি করা। সে ক্ষেত্রে সারা বিশ্ব তাকে সমীহ করতে বাধ্য হবে। মোট কথা হল যুক্তরাষ্ট্র চায় মধ্যপ্রাচ্যকে কব্জা করতে।[১৫]

৫. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০১১ সালে তেলসমৃদ্ধ লিবিয়া দখল করলো। মার্কিন সরকারের হিসেবে লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট মোয়াম্মার গাদ্দাফির ছিলেন "অবিশ্বাসযোগ্য ডিক্টেটর" (unreliable dictator)। লিবিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন ছিল "প্রভুভক্ত ডিক্টেটর" (কারণ গাদ্দাফি "যথেষ্ট মাত্রায় বেয়াড়া" এবং "কোনো কথাই শোনে না")। লিবিয়া দখল করে প্রভুভক্ত ডিক্টেটর বসালে একই সাথে অনেক উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব হবে। যেমন, পাওয়া যাবে অফুরন্ত তেল; আফ্রিকার রাজনীতি বিশেষত সাব-সাহারিয়ান আফ্রিকার (পশ্চিম সাহারা, মৌরিতানিয়া, সেনেগাল, মালি, নাইজার, চাঁদ, উত্তর সুদান, ইরিত্রিয়া) রাজনীতিতে আরও বেশি ফলপ্রদ অনুপ্রবেশ করা যাবে; মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ সৌদি আরব-কুয়েত-বাহরাইন-ওমানসহ যত প্রভুভক্ত রাজা-বাদশাহ-ডিক্টেটর আছে তাদের "প্রভুভক্তিতে" যেন ঘাটতি না হয় তা চিরতরে মুখস্থ করিয়ে রাখা যাবে এবং সেই সাথে বোঝানো যাবে "অবাধ্যতার শাস্তি কেমন হয়; মিশর ও তিউনিসিয়াকে ঠিকঠাক রাখার প্রয়াস চালানো যাবে; ভূমধ্যসাগরের আশেপাশের ইউরোপিয় ও আফ্রিকার দেশসমূহে ভূ-জল রাজনীতি সহজতর হবে ইত্যাদি।

---

[১৫] দেখুন: বারকাত আবুল, ২০১৩, বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি; পৃ: ২-৩; নোয়াম চমস্কি; ২০০৫: Imperial Ambitions, London: Penguin Books,পৃ: ৫-৭,। ২৭ বছর বয়সী একজন মার্কিন যুবক যিনি ইরাক যুদ্ধে গিয়েছিলেন এবং যুদ্ধপরবর্তীকালে "ওয়ালস্ট্রিট দখল করো" আন্দোলনে (Occupy Wall Street Movement) অংশগ্রহণ করেছিলেন তার প্রণিধানযোগ্য ভাষ্যটি এরকম "আমি আমেরিকার জনগণের স্বার্থ রক্ষা করতে ইরাক যুদ্ধে গিয়েছিলাম। শেষে আবিস্কার করলাম যে আমি আসলে রাজনৈতিকভাবে সংশ্লিষ্ট কন্ট্রাকটারদের মুনাফা তৈরিতে সহায়তা করলাম" (দেখুন, চাক কলিন্স, ২০১২, 99 To 1: How Wealth Inequality is Wrecking the World and What We Can Do About It. Noida: HarperCollins Publishers India Ltd, পৃ: ২)।

সুতরাং, ১৯৬০-৭০-৮০ এর দশকে ল্যাতিন আমেরিকা হয়ে ১৯৯০-এর দশক থেকে এখন পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের ইরাক হয়ে আফ্রিকার (মাথার উপরের) লিবিয়া দখল ও ঐসব দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বশংবদ পাপেট ডিক্টেটর অথবা 'নির্বাচিত'(?) সরকার বসানোর উদ্দেশ্য একটাই– "আমরা বিশ্ব প্রভু– বৈশ্বিক সম্রাট" এটা প্রমাণ করা। লিবিয়ার ক্ষেত্রে যেভাবে ঘটনাটা ঘটানো হয়েছে তা যেকোনো মাপকাঠিতে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস ও যুদ্ধাপরাধতুল্য। বিষয়টি এরকম: প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লিবিয়ায় গাদ্দাফির বিরুদ্ধে মার্কিনভক্ত একদল সশস্ত্র বিদ্রোহী সৃষ্টি করলো এবং লিবিয়ার রাজধানী বেনগাজিতে গাদ্দাফি বাহিনির সাথে গাদ্দাফি বিরোধী মার্কিন সৃষ্ট সশস্ত্র বিদ্রোহীরা যুদ্ধ করলো; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্ব কোনোভাবেই চাইলো না যে গাদ্দাফি তার সেনাশক্তি বাড়িয়ে ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রেখে বিদ্রোহীদের দমন করুক। এ অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ তাদের পশ্চিমা সম-স্বার্থ গোষ্ঠী লিবিয়ায় শান্তির(!) কথা বলে তাদেরই অশুভ চতুর্ভুজের এক বাহু জাতিসংঘকে ব্যবহার করলো (অন্য তিন ভুজ হলো বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা)। বেশ বুদ্ধি খাটিয়ে তারা তাদেরই নিয়ন্ত্রণাধীন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে লিবিয়ার জন্য "No fly zone" (অর্থাৎ যে অঞ্চলে কোনো সামরিক বিমান যাতায়াত করতে পারবে না) সিদ্ধান্ত পাশ করলো এবং একই সাথে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ থেকে এটাও পাশ করিয়ে নিলো যে লিবিয়ার সাধারণ নিরীহ নাগরিকদের সুরক্ষার দায়িত্ব সম্মিলিতভাবে পালন করবে ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (অর্থাৎ তিন আদি সাম্রাজ্যবাদ)। কিন্তু বাস্তবে জাতিসংঘের এই সিদ্ধান্ত অতি দ্রুত লঙ্ঘন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সৃষ্ট বিদ্রোহীরা সরাসরি সশস্ত্র কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকলো আর গাদ্দাফির জন্য নির্ধারিত হলো যুদ্ধ-বিরতি (cease-fire); ঐ তিন-শক্তি (ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র) বিদ্রোহীদের লিবিয়ার পশ্চিমে অগ্রসর হতে সহায়তা দিল এবং স্বল্প সময়েই তারা লিবিয়ার তেল উৎপাদনকারী সব অঞ্চল দখল করে ফেললো; গাদ্দাফিকে হত্যা করা হলো; সৃষ্টি হলো নতুন লিবিয়া– "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পুষ্ট লিবিয়া রাজতন্ত্র"।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ রাজতন্ত্রী দেশসমূহ– সৌদি আরব-কুয়েত-কাতার-ওমান-বাহরাইন যথেষ্ট মাত্রায় প্রভুভক্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী-আধিপত্যবাদী গোষ্ঠীর সেবাদাসত্বে তাদের তুলনা নেই। সৌদি আরব সরকার ২০১১ সালে (৫ মার্চ) এ বলে আইন জারি করে যে ইসলামি শারিয়াহ, সৌদি রীতি ও ঐতিহ্য সুরক্ষার স্বার্থে সৌদি রাজত্বে কোনো ধরনের বিক্ষোভ, পথসভা, পথযাত্রা, অবস্থান ধর্মঘট জাতীয় কোন কিছু করা যাবে না। এবং এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকরী করতে প্রচুর সংখ্যক নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়। কুয়েতে ছোট মাপের বিক্ষোভ মিছিল গুড়িয়ে দেয়া হয়। বাহরাইনে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম শিয়া গোষ্ঠী ও অন্যান্যেরা যখন সংখ্যালঘু সুন্নি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপন করে তখন সৌদি সেনাবাহিনী তাতে হস্তক্ষেপ করে। বাহরাইন যথেষ্ট স্পর্শকাতর এলাকা (দেশ)– কারণ ওখানে একদিকে আছে যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চম-নৌবহর ঘাটি আর অন্যদিকে সৌদি আরবের সবচে তেলসমৃদ্ধ এলাকায় যোগাযোগের সহজ পথ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী মহা-কৌশল-এর লক্ষ্যই হলো এরকম যা পৃথিবীর কোনো দেশেই "বৈষম্য হ্রাসকারী অসাম্প্রদায়িক উন্নয়ন দর্শন" বাস্তবায়ন হতে দেবে না। দিতে পারে না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একচ্ছত্র বিশ্বপ্রভুত্ব-উদ্দিষ্ট মহা-কৌশলের বৈশিষ্টসূচক রূপসমূহ নিম্নরূপ:

১. "আমরা বিশ্বের মালিক" (We own the world)– সুতরাং "বিশ্বের সবকিছুই আমাদের, অন্যদের জন্য কোনো কিছুই নয়" এবং "অন্য দেশ জবরদখল করা এটা আমাদের অধিকার, আর অন্যরা এসব করলে তা হবে সন্ত্রাস।[১৬]

২. 'আইনের শাসন' (rule of law) অন্যদের জন্য প্রযোজ্য আর আমাদের জন্য প্রযোজ্য 'শক্তি প্রয়োগের শাসন' (rule of force)।

৩. "যখন যেখানে ইচ্ছে আশংকামূলক যুদ্ধ (preventive war at will not preemptive war) করার অধিকারটা শুধু আমাদেরই আছে" (আসলে "আশংকামূলক বা প্রতিষেধমূলক যুদ্ধ" আন্তর্জাতিক আইনে "যুদ্ধাপরাধ" তুল্য)।

৪. "আমাদের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের) ক্ষমতা, অবস্থান ও সম্মানহানিকর যে কোনো চ্যালেঞ্জ যে কোনো মূল্যে মোকাবেলার একমাত্র অধিকারী আমরাই"; "আমরাই যে কোনো দেশে যে কোনো মুহূর্তে শাসক গোষ্ঠী পরিবর্তনে একমাত্র নির্ধারণ কর্তা– আমরা বিশ্ব প্রভু"।

৫. মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী মহা-কৌশলিক লক্ষ্যের কেন্দ্রীয় উপাদান হলো– "বৈশ্বিক কাঠামোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও অর্থনৈতিক একচ্ছত্র প্রাধান্য-আধিপত্য প্রতিষ্ঠার একাঙ্গীভূত নীতি" (integrated policy to achieve military and economy supremacy of USA)। আর এই ভয়াবহ নীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুসিদ্ধান্ত হলো "অতন্দ্র প্রহরা দাও যেন কোথাও কোনো দেশে কোনো ধরনের স্বাধীন উন্নয়ন না ঘটে যায়; যেন কোনো দেশে এমন কোনো কিছু না ঘটে যায় যার ভাইরাস অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে"। এসবই কারণ যে কারণে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিসা রাইস ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মন্‌সের মোত্তাকিকে বলেছিলেন "আপনাদের স্পষ্টভাবে যা করতে হবে তা হলো: বিদেশি যোদ্ধাদের অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করুন এবং বিদেশি যোদ্ধাদের সীমান্ত দিয়ে আনাগোনা বন্ধ করুন"। এ ক্ষেত্রে 'বিদেশি' অর্থ 'ইরান'; আর "মার্কিন যোদ্ধা" এবং "মার্কিন সমরাস্ত্র" ইরাকে 'বিদেশি নয়' (কারণ "আমরা বিশ্বের মালিক")।[১৭]

৬. মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মহা-কৌশলিক নীতিটা যে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন তা 'সন্ত্রাস' (terror, terrorism) বিষয়ে তাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃত অভিধান দেখলেই সহজেই অনুমান সম্ভব। 'সন্ত্রাস' বিষয়ে মার্কিন সরকারের অফিসিয়াল মত এরকম: "আমাদের অথবা আমাদের ক্লায়েন্টদের বিরুদ্ধে অন্যদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হল চূড়ান্ত পাপ, আর অন্যদের বিরুদ্ধে আমাদের সন্ত্রাস বলে কিছু নেই, অথবা, যদি সেটা হয়েও থাকে সেক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ যথোচিত কাজ"। এসব কারণেই প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাবলু বুশ-এর একজন উর্ধ্বতন উপদেষ্টা বলেছেন "আমরা (অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) এখন একটা সাম্রাজ্য, এবং আমরা যখন একটা কোনো কিছু করি (act অর্থে) তখন আমরা আমাদের নিজস্ব এক বাস্তবতা সৃষ্টি করি।

---

[১৬] এ প্রসঙ্গে জলদস্যু নিয়ে সেইন্ট অগাস্টিনের একটা গল্প প্রণিধান যোগ্য। মহাবীর আলেকজান্দার দ্য গ্রেট একজন জলদস্যুকে সমুদ্রে ধরে ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন "কোন সাহসে তুমি সমুদ্রকে উত্যক্ত -বিরক্ত করছো? কম্পিত কণ্ঠে জলদস্যুর উত্তর "কোন সাহসে তুমি সমগ্র পৃথিবীকে উত্যক্ত করছো? জলদস্যু নিজ থেকেই উত্তর দিয়ে বললো– "যেহেতু আমি একটা ছোট্ট জাহাজে এসব করছি সেহেতু আমি একজন ছ্যাচকা চোর মাত্র, আর যেহেতু তুমি বিশাল এক নৌবহর নিয়ে এসব করছো সেহেতু তুমি সম্রাট"।

[১৭] নোয়াম চমস্কি, ২০১২, Making the Future, London: Penguin Books, পৃ: ২৬।

> এবং যখন আপনারা বিচারবোধ থেকে ঐ বাস্তবতা বুঝবার চেষ্টায় অনুসন্ধানে লিপ্ত হন (study অর্থে), যা আপনারা করেন– তখনই আমরা আবার অন্য কিছু একটা করে ফেলি– অন্য আর একটা নিজস্ব বাস্তবতা সৃষ্টি করি, যা আবার আপনারা বুঝবার চেষ্টা করেন, এবং এভাবেই চলতে থাকে। আমরা হলাম ইতিহাসের নায়ক... আর আপনারা, আপনাদের সবাইকে আমরা কি করছি তা বঝুবার চর্চ্চায় ব্যস্ত রাখি"।[১৮]

ইতিহাস সৃষ্টির নায়ক(!) হিসেবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যা ইচ্ছে-যেখানে ইচ্ছে-যখন ইচ্ছে তাইই করতে পারে– এটাই তাদের মহা-দর্শনের, মহা-কৌশলের মূল নীতি। এ প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর চার মৌল-কৌশলিক সম্পদের (জমি, পানি, জ্বালানি-খনিজ, মহাকাশ) উপর একক-নিরঙ্কুশ মালিকানা এবং একচ্ছত্র কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বৈশ্বিক অর্থনীতি, আর্থিক শক্তি, রাজনৈতিক শক্তি, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় গণমাধ্যম, থিংক ট্যাংক (অধিকাংশই মহাচিন্তা-দুশ্চিন্তার বৃদ্ধিবৃত্তিক জালিয়াতির কারখানা), বৈশ্বিক সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠান– এসব কিছুকেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যখন ইচ্ছে, যেমন ইচ্ছে তেমনভাবেই ব্যবহার করবে। আগেই বলেছি এ তাদের অধিকার! একটু আগে লিবিয়া দখলের বাস্তব প্রক্রিয়ায় তারা কিভাবে-কোন কায়দায়-কোন সময়ে পৃথিবীর সকল দেশের সংঘ– জাতিসংঘকে (যেখানে 'এক রাষ্ট্র এক ভোট'-এর মত গণতন্ত্র আছে আবার পাঁচ রাষ্ট্রের "ভেটো" দেবার অধিকারের মত স্বৈরাচারী ব্যবস্থাও আছে) ব্যবহার করেছে তা বিশ্লেষণ করেছি।

৩. পূর্ব বাংলায় ইসলাম ধর্মের উদ্ভবঃ ঐতিহাসিকভাবেই উদারনৈতিক, মানবিক এবং অসাম্প্রদায়িক

পূর্ব বাংলায় ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি-ইতিহাস নিয়ে ঐতিহাসিকেরা যা কিছু লিখেছেন তার অধিকাংশই অসম্পূর্ণ এবং নয় তা যথেষ্ট তথ্যভিত্তিক। ভূগোল, নদীর প্রবাহ পরিবর্তন, কৃষি সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ, ভূমি খাজনার গতি প্রকৃতি, ঘটনাপঞ্জির কালানুক্রমিক গ্রন্থনা, হিন্দু রাজা ও মুসলমান সম্রাটদের রাজ্যনীতি– পূর্ব বাংলায় ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ ইতিহাস রচনায় এসব তথ্যের নির্মোহ বিশ্লেষণ নেই বললেই চলে। সংশ্লিষ্ট ইতিহাস রচনার তত্ত্ব এদিক থেকে যথেষ্ট দুর্বল।

পূর্ব বাংলায় ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ ইতিহাসে মূলত চার ধারার বক্তব্য পাওয়া যায়ঃ অভিবাসন (immigration), তরবারি (sword), পৃষ্ঠপোষকতা (patronage), ও সামাজিক মুক্তি (social liberation)। ইতোমধ্যে উল্লিখিত কারণে এসবের কোনোটিই পুর্ণাঙ্গ নয়ঃ অভিবাসিত কারা, কখন-কোন সময়ে-কি কারণে অভিবাসন হলো (?); তরবারির শক্তি কখন কোথায় এ দেশে ইসলামকে গণধর্মে (mass religion) রূপান্তর ঘটালো (?); এমনকি সবচে' বেশি রক্ষণশীল মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবও জোরজবরদস্তি উৎসাহ দেননি (আকবর বৈষম্যমূলক খাজনা বন্ধ করেছিলেন; হিন্দু ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করিয়েছিলেন) ইত্যাদি।

এদেশে ইসলাম ধর্মের মূল প্রচারকেরা অর্থাৎ সুফি-সাধক-ওলামারা শত শত বছর ধরে কোনো উগ্র ধর্মীয় আচার প্রচার করেননি; এমন কি তাঁরা তা সমর্থনও করেননি। উল্টো তারা ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা প্রচারের স্থানটিকে (যেমন মাজার, মসজিদ, মাদ্রাসা ইত্যাদি) রেখেছিলেন আয়তনে ছোট, আর বড় করেছিলেন পশ্চাৎপদ অঞ্চলে বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে কৃষি কাজের এলাকা। পশ্চাৎপদ এলাকার এ

[১৮] স্টিকানেই, জন, ২০১২, Foreword: Remaking the Future, নোয়াম চমস্কির (গ্রন্থ, ২০১২), Making the Future, London: Penguin Books, পৃঃ ১১।

সব বন-জঙ্গল তারা পেয়েছিলেন অনুদান হিসেবে। অর্থাৎ তারা মানুষকে সম্পৃক্ত করেছিলেন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে-মূলত কৃষি কাজে। সেই সাথে সুফিরা যত না অন্য ধর্মের মানুষকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন সেবাধর্মী কর্মকাণ্ডে। "আশরাফুল মাখলুকাতের সেবাই ধর্ম"– এ তাদেরই কথা। সুফিরা কখনও কোথাও হিন্দুদের মন্দির-উপাসনালয় ভেঙ্গেছেন– এমন কোনো নজির নেই।

সুফি-ওলামারা ইসলাম ধর্মের মতাদর্শের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ কৃষিভিত্তিক কর্মকাণ্ডের সম্মিলন ঘটিয়েছিলেন (অবশ্য নগর-কেন্দ্রিক আশরাফতন্ত্রের বিশ্লেষণ ভিন্ন)। সুফি সাধকদের লিখিত বর্ণনায় এমনও পাওয়া যায় যে "আল্লাহ্ আদমকে সন্দ্বীপে প্রেরণ করলেন। জিবরাইল তাকে আল্লাহর নির্দেশে মক্কায় মূল কাবাঘর নির্মাণের জন্য যেতে বললেন। কাবা নির্মাণের পরে জিবরাইল তাকে একটি লাঙ্গল, একটি জোয়াল, এক জোড়া চাষের বলদ, কিছু শস্যদানা দিয়ে বললেন– আল্লাহর নির্দেশে কৃষিকাজই হবে তোমার নিয়তি (destiny)। আদম শস্য দানা বপন করলেন, শস্য ফলালেন, মাড়াই করলেন, শস্য থেকে রুটি বানালেন"।[১৯] অর্থাৎ পূর্ব বাংলায় ইসলাম ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশে তরবারি, অভিবাসন অথবা পৃষ্ঠপোষকতার তেমন কোনো ভূমিকা নেই, এখানে ইসলাম বিকশিত হয়েছে কৃষিভিত্তিক সভ্যতা বিকাশের অনুষঙ্গ হিসেবে। ইসলাম ধর্মের সুফি সাধকসহ অন্যান্য অনেক ধর্ম প্রচারক এ দেশে সামন্তবাদ ও ঔপনিবেশবাদ বিরোধি লড়াই-সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন; এমনকি নেতৃত্বও দিয়েছেন। এবং সুফি-ওলামারা ধর্মের উদারনৈতিক-মানবিক যুক্তি ব্যবহার করেই তা করেছেন। সুতরাং বিশ্লেষণ এটাই প্রমাণ করে যে উদ্ভব সূত্রে এ দেশে ইসলাম মানবতাবাদী, উদারনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক। অর্থাৎ এ দেশের মুসলমানেরা ঐতিহাসিকভাবেই এক পজিটিভ ডিএনএ-র বাহক। আমাদের দেশে ইসলাম ধর্মের এ পজিটিভ ডিএনএ-র কারণেই সশস্ত্র জঙ্গিত্ব ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সহায়ক হতে পারে না। অবশ্য ইসলাম ধর্মের উদ্ভব সূত্রের এই পজিটিভ ডিএনএ নিয়ে আত্মতুষ্ট হওয়া সমীচীন হবে না এজন্য যে ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিবাদ বিকশিত হবার পেছনে দেশজ ও বৈশ্বিক অনেক কারণ বিদ্যমান। যা ইতোমধ্যে বিশ্লেষিত হয়েছে এবং পরেও বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হবে।

৪. "উদারনৈতিক ইসলাম" থেকে "রাজনৈতিক ইসলাম": সমকালীন পশ্চাদমুখী রূপান্তর

উদ্ভবসূত্রে যখন পূর্ববাংলায় ইসলাম ধর্ম উদারনৈতিক, মানবিক, ও অসাম্প্রদায়িক তখন এমন কী ঘটলো যার ফলে তা মৌলবাদী জঙ্গিত্বে রূপ নিলো? আমার মতে পশ্চাদমুখী এ রূপান্তরে তিনটি বড় মাপের ঘটনা দায়ী। পশ্চাদমুখী রূপান্তরের বড় মাপের ঘটনা তিনটি হলো যথাক্রমে:

(১) ১৯৪৭-এ দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি,

(২) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মাধ্যমে জেনারেল জিয়াউর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের সংবিধান থেকে "ধর্মনিরপেক্ষতা" (secularism) স্তম্ভটি সম্পূর্ণ উচ্ছেদ এবং পরবর্তীতে "ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্র ধর্ম" হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা,

(৩) একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি না দিতে পারা।

---

[১৯] রিচার্ড ইটন, ১৯৯৬, "The Rise of Islam and the Bengal Frontier-1206-1760"

পূর্ব বাংলায় ইসলাম ধর্মের ইতিহাসে প্রথম বড় মাপের পশ্চাদমুখী রূপান্তর (বিপর্যয়) ঘটেছে গত শতাব্দিতে যখন ব্রিটিশ ঔপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের এক পর্যায়ে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ এলো– অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান আর হিন্দুদের জন্য হিন্দুস্থান। সাম্প্রদায়িক ধর্ম-ভিত্তিক দেশ বিভাজনে ইসলাম ধর্মের উদারনৈতিক-মানবিক ধারার সুফি-ওলামারা বাধা দিতে পারলেন না। মূল ধারার বিপরীতে পশ্চাদমুখী এ রূপান্তর (regressive transformation) হঠাৎ ঘটেনি– এর পিছনে জঙ্গিবাদী সুনির্দিষ্ট ধারা (যেমন ওহাবি ইত্যাদি) কাজ করেছে। ফলে ইসলাম ধর্মের মানবকল্যাণকামী সুফি-ওলামা চেতনার এক ঋণাত্মক উত্তরণ ঘটলো– যা ছিলো উদারনৈতিক-মানবতাবাদী তা রূপান্তরিত হলো সংকীর্ণ জঙ্গিত্বে; উদ্দেশ্য ছিল সংকীর্ণ স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা। অর্থাৎ ধর্ম-ভিত্তিক পাকিস্তান সৃষ্টির সাথে সাথে এদেশে ইসলাম ধর্মের বিকাশে এক নূতন প্রবণতা সৃষ্টি হল: কৃষি উন্নয়নের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক বিকাশের ধারা থেকে ধর্মভিত্তিক সশস্ত্র মৌলবাদ ধারণাপুষ্ট রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রবণতা। পাকিস্তানে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার এ ধারা এতই প্রবল হলো যে ১৯৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের সব হিন্দুদের হিন্দুস্থানি বানাতে তৎকালীন সামন্ত-সেনা শাসকদের চব্বিশ ঘণ্টা সময়ও লাগেনি– "জরুরি অবস্থায়" জারি করলেন "শত্রু সম্পত্তি আইন" যেখানে হিন্দু মাত্রেই শত্রু। রাষ্ট্র-পরিতোষিত ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতার এমন নমুনা পূর্ব বাংলার ইতিহাসে এর আগে কখনো দেখা যায়নি।

ধর্মভিত্তিক দেশ বিভাগ ঘটেছে সাধারণ মানুষকে (হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান যে ধর্মই হোক না কেন) জিজ্ঞাসা না করে; তাদেরকে দেশ বিভাগ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত না করে: তাদের মতামত উপেক্ষা করে– যে কারণে সমসাময়িক সময়ে একদিকে যেমন ধোকাবাজি স্লোগান ছিল "*হাত মে বিড়ি মু মে পান লাড়কে ল্যঙ্গে পাকিস্তান*" আর অন্যদিকে সুদূরপ্রসারি চিন্তার মানুষরা বলেছিলেন "*ইয়ে আজাদি ঝুটা হায় লাখো ইনসান ভূখা হায়*"। ধর্মভিত্তিক দেশ বিভাগটা হয়েই গেলো (তাতে মানুষের মতামত নেবার প্রয়োজন পড়েনি)। মোটামুটি এক ধর্মের মানুষের সংখ্যাধিক্য আর রাষ্ট্র পরিচালনায় গণতান্ত্রিক চেতনার বিপরীতে ধর্ম ব্যবহারের আধিক্য হেতু সামন্ত-চেতনার পাকিস্তান রাষ্ট্রটিতে ধর্মীয় জঙ্গিত্ব ও সংশ্লিষ্ট মানসিকতা যত প্রবল রূপ নিলো ভারতে ঠিক ততটা হলো না। কারণ বিশাল ভারতে বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের মানুষের সমাহার এবং সেই সাথে শুরু থেকেই অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বিকাশে সাম্য-সমতাধর্মী বিষয়াদিকে সংবিধানিকভাবেই স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল।[২০]

পাকিস্তান রাষ্ট্রের পুরো সময়টা (১৯৪৭-৭১) রাষ্ট্র পরিচালন এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনে ধর্ম-ভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতাকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যে কোনো রাজনৈতিক-সামাজিক সংকট উত্তরণে ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে– বিপদাপন্ন হলেই বলা হয়েছে "ইসলাম বিপন্ন" (ইসলাম খতরে মে হ্যায়"); মিলিটারি শাসন ও স্বৈরাচার বলবৎ রাখতে "ইসলামের বিপন্নতা" ছিল একমাত্র স্লোগান। সবশেষে এটাই ব্যবহার করা হয়েছে ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে– "ইসলামের বিপন্নতা" ব্যবহৃত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যখন পাঞ্জাবি-সিন্ধি-বেলুচ সৈন্য আনা হয়েছে তখন (অবশ্য তাদের অনেকেই এদেশে এসে ভিন্ন চিত্র দেখেছেন এবং শাসকগোষ্ঠীর ধোকাবাজি বুঝতে পেরেছিলেন); একই স্লোগান ব্যবহৃত হয়েছে এদেশে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী গুটি কয়েক বাঙ্গালি মুসলমান নিয়ে শান্তি কমিটি, আল বদর, আল শামস, রাজাকার ইত্যাদি বাহিনী গঠন প্রক্রিয়ায়। এরা নিশ্চিত ছিল যে মুক্তি-স্বাধীনতা চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙ্গালিরা পরাক্রমশালী পাক সেনাবাহিনী ও রাজাকার-আলবদরদের কাছে পরাজিত হবে। কিন্তু ঘটেছে উল্টোটা।

[২০] তবে ভারতে ধর্মভিত্তিক বর্ণপ্রথার শক্ত ভিত ও মৌলবাদি হিন্দুত্ববাদের সুদৃঢ় অস্তিত্বের কারণে ভারতের ভবিষ্যত সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়ন যে যথেষ্টমাত্রায় বাধাগ্রস্ত হবে একথা অনস্বীকার্য।

এদেশে ঐতিহাসিক উদ্ভবসূত্রে সকল ধর্মই দেশের মাটি উত্থিত এবং উদ্ভবসূত্রে উদারনৈতিক ও মানবতাবাদী। ইসলাম ধর্মও ব্যতিক্রম নয়। আগেই বলেছি ঐতিহাসিকভাবেই পূর্ববাংলায় উদ্ভবসূত্রে ইসলাম ধর্ম ছিল উদারনৈতিক, মানবিক এবং অসাম্প্রদায়িক। কিন্তু সময়ের প্রেক্ষিতে আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্টতার ফাঁদে পড়ে কালানুক্রমে তা "রাজনৈতিক ইসলামে" (Political Islam) রূপান্তরিত হয়। এদেশে ইসলাম ধর্মের বড় মাপের পশ্চাদমুখী রূপান্তর (regressive transformation) ঘটে তিন দফায়। প্রথমটি ঘটে "দ্বিজাতি তত্ত্বের" ভিত্তিতে ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে যখন ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন হলো তখন (অর্থাৎ ১৯৪০-এর দশকে শুরু হয়ে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় পর্যন্ত), আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পশ্চাদমুখী বিপর্যয় ঘটে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে যখন আমরা মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দলকে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও যুদ্ধাপরাধের জন্য শাস্তি দিতে ব্যর্থ হলাম এবং প্রায় একই সময়ে বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অর্জন দেশ-সমাজ-রাষ্ট্র বিনির্মাণে অন্যতম গণ-আকাঙ্ক্ষা "ধর্মনিরপেক্ষতা" (যা ছিল আমাদের প্রথম সংবিধান— ১৯৭২-এর সংবিধানের অন্যতম মূল নীতি)-কে অবৈধ প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালে চূড়ান্তভাবে বিলুপ্ত ঘোষণা করেন (দেখুন, Second Proclamation Order No. VI of 1978)। ইসলাম ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতার উত্থান কাজটি জিয়াউর রহমান শুরু করেন ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার প্রণীত "দালাল আইন"টি ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৫-এ বাতিল ঘোষণা করে। ১৯৭২-এর সংবিধানে যেখানে যতটুকু ধর্মনিরপেক্ষতার কথা উল্লেখ ছিলো সবকিছুই অবৈধ প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৭-৭৮ সালে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত ঘোষণা করে তার জায়গায় "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস" সংযোজন করে ইসলামভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, মৌলবাদী জঙ্গিত্বের পথ সচেতনভাবেই সুপ্রশস্ত করলেন। ১৯৭২-এর বঙ্গবন্ধু সরকার প্রণীত মূল সংবিধানের সাথে অবৈধ প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ঘোষিত দ্বিতীয় ঘোষণা (সংশাধনী) অর্ডার ১৯৭৮ [Second Proclamation (Amendment) Order, 1978] তুলনা করলেই বুঝতে কোনোই অসুবিধা হয় না যে জিয়াউর রহমানই ছিলেন ইসলাম ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের পুরোধা ব্যক্তি। অবৈধ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭২-এর মূল সংবিধানে অবৈধ যেসব পরিবর্তন আনলেন তার মধ্যে অন্যতম হল নিম্নরূপ:

১. সংবিধানের প্রস্তাবনার প্রথম অনুচ্ছেদে "জাতীয় মুক্তি" শব্দের জায়গায় বসালেন "জাতীয় স্বাধীনতা", আর "ঐতিহাসিক সংগ্রামের" জায়গায় বসালেন "ঐতিহাসিক যুদ্ধের" শব্দ।

২. সংবিধানের প্রস্তাবনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে "ধর্মনিরপেক্ষতার" পরিবর্তে লিখলেন "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস"; শুধু তাই নয় ১৯৭২-এর সংবিধানে যেখানে সংবিধানের চার মূল নীতির মধ্যে চতুর্থ স্থানে ছিল "ধর্মনিরপেক্ষতা" সেখানে পরিবর্তিত সংবিধানে "ধর্মনিরপেক্ষতা" শব্দ বিলুপ্ত করে চার মূলনীতির প্রথম স্থানে বসালেন "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস" শব্দসমূহ।

৩. মূল সংবিধানের ৮ (১) অনুচ্ছেদে "ধর্মনিরপেক্ষতাকে" প্রতিস্থাপিত করা হল "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস" শব্দসমূহ দিয়ে; আর ৮ (২) অনুচ্ছেদে "এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ পরিচালনার মূল সূত্র হইবে"-র জায়গায় অন্তর্ভুক্ত করলেন নতুন বাক্য "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি"।

৪. মূল সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০ যেখানে শোষণমুক্ত, ন্যায়ানুগ, সাম্যবাদী সমাজ, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ব্যবস্থার কথা উল্লেখ ছিল তা সম্পূর্ণ বাতিল করলেন।

৫. সম্পূর্ণ বিলুপ্ত ঘোষণা করলেন মূল সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২ যেখানে বলা হয়েছিল "ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদান, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ধর্মের অপব্যবহার, কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাঁহার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হইবে"।

৬. মূল সংবিধানের ৩৮ নং অনুচ্ছেদ যেখানে সুস্পষ্ট উল্লেখ ছিল যে "রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী কোন সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সংঘ কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোন সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার বা তাহার সদস্য হইবার বা অন্য কোন প্রকারে তাহার তৎপরতায় অংশগ্রহণ করিবার অধিকার কোন ব্যক্তির থাকিবে না"— জিয়াউর রহমান সংবিধান থেকে এসব সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে ছাড়লেন।

উল্লিখিত এসবই স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে আজ যে ইসলামভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, মৌলবাদের অর্থনীতি, মৌলবাদের রাজনীতি, মৌলবাদী জঙ্গিত্ব আমরা দেখছি — এসব কিছুরই মূলে ছিল অবৈধ ক্ষমতায় স্বৈরাচারী ও চরম বিশ্বাসঘাতক প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। এসব করে জিয়াউর রহমান মহান মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত সংবিধানের মৌলিক চরিত্র-বৈশিষ্ট্যই পাল্টে দিলেন এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা উল্টে দিয়ে রাষ্ট্রদ্রোহ তুল্য অপরাধ করলেন। এহেন অবস্থায় যে কেউই যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন উত্থাপন করতেই পারেন যে জিয়াউর রহমানের মতাদর্শে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল কিনা, নাকি তিনি পাকিস্তানপন্থি দালাল ছিলেন? প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতেই পারে যে জিয়াউর রহমান প্রজাতন্ত্রের মূল সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিসর্জন দিয়ে জামায়াতে ইসলামির দৃশ্যমান মূল নেতাদের গোপন মূল নেতা ছিলেন কিনা? এ প্রশ্নও উত্থাপন আদৌ অযৌক্তিক হবে না যে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সংবিধানের চার মূল নীতির অন্যতম নীতি ধর্মনিরপেক্ষতা বাতিল করে দেশকে ইসলামি রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন কিনা? খুব যৌক্তিক হবে যদি কেউ প্রশ্ন তোলেন যে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি উচ্ছেদ করে জিয়াউর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে "ইসলামি বাংলাদেশে" অথবা "বাংলাদেশের পাকিস্তানীকরণের" মূল স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন কিনা? আরও মারাত্মক প্রশ্ন হতে পারে এমন যে অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি উচ্ছেদকারী জিয়াউর রহমান কি প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন (Freedom fighter by choice) নাকি ঘটনাচক্রে মুক্তিযোদ্ধা (Freedom fighter by chance) ছিলেন, নাকি মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের চর ছিলেন (spy of anti-liberation forces)। আমি তো আরও মারাত্মক ও আরও ভয়াবহ উপসংহারে উপনীত হতে পারি যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বপ্রভুত্ব কায়েমের লক্ষ্যে তার মহাকৌশলের (grand strategy) অংশ হিসেবে বিশ্বের তেল ভাণ্ডার (যা প্রধানত মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে কেন্দ্রীভূত) জবরদখলের উদ্দেশ্যে সমাজতন্ত্রকামী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করেছিলো এবং যারই অংশ হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করেছিলো যে হত্যাকাণ্ড যারা ঘটিয়েছিলেন তাদের হোতা ছিলেন জিয়াউর রহমান। যে জিয়াউর রহমানকে দিয়েই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রথমে গায়ের জোরে (একে বলে "থুকোডাইডিস নীতি" ও "মন্‌রো মতবাদ") সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাতিল করে সাম্প্রদায়িকতা— ইসলাম ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিলো এবং একই সময়ে অসংখ্য প্রকৃত

মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করেছিল; আর সেটা করেছিলো মৌলবাদী জঙ্গিত্ব উত্থানের পূর্বশর্ত হিসেবে যার ফলে ঘটনার শুরুর ২৫-৩০ বছর পরে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশকে "মডারেট মুসলিম দেশের" তকমা জুড়ে দিয়ে পরবর্তী কোন এক সময়ে রাষ্ট্র ক্ষমতাটাই জঙ্গিদের হাতে তুলে দিয়ে ইসলামি জঙ্গিবাদী রাষ্ট্র খেতাব দিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদসমৃদ্ধ এবং ভৌগোলিক-রাজনৈতিক কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ দেশ বাংলাদেশকে দখল করা যায়। যদি আমার এ উপসংহার সঠিক হয় তাহলে মুক্তিযোদ্ধা(?) জিয়াউর রহমান আসলে কে? কি তার প্রকৃত পরিচয়? ইতিহাস কিভাবে তাকে ক্ষমা করবে? তার দলই বা এ ফাঁদ থেকে কিভাবে বেরুবে?

অনেক রক্ত, ত্যাগ-তিতিক্ষার মূল্যে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। তবে দীর্ঘ ৪০ বছর মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী যুদ্ধাপরাধী জাতীয় শত্রুদের কোনো ধরনের শাস্তির বিধান আমরা করতে পারিনি। এটাও পরবর্তীকালে তাদের ঔদ্ধত্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। ঐ ধর্ম ব্যবসায়ী গোষ্ঠী (কোনো অর্থেই সুফি-ওলামাদের মত ধার্মিক নন) এবং উগ্র-সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন তাদের কিছু অনুসারীরাই বাংলাদেশে মৌলবাদী রাজনৈতিক অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিদের প্রতিভূ। এদেশে ধর্মের ইতিহাসে এ এক চরম বিকৃতিকাল– বলা যায় পশ্চাদমুখী রূপান্তরের তৃতীয় কালপর্ব। আর বলা যায় ইসলাম ধর্মের পশ্চাদমুখী রূপান্তরে "হেফাজতে ইসলাম" হলো তৃতীয় কালপর্বের মোটামুটি চূড়ান্ত রূপের অন্যতম বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এ দেশে ইসলাম ধর্মের ঐতিহাসিক মূল ধারার (সুফিবাদ) বিকাশের সাথে বর্তমান মৌলবাদী রাজনীতি-অর্থনীতির বিপরীতধর্মী পার্থক্যটা এখন স্পষ্ট। ইসলাম ধর্মের পশ্চাদমুখী রূপান্তর ও ধর্মের রাজনীতিকরণের নিট ফল হলো এই যে তা আলোকিত মানুষ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানসমৃদ্ধ আলোকিত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো।

পাকিস্তান রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িকতা শুধু রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি হিসেবেই কাজ করেনি তা শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। দুই অর্থনীতির বৈষম্যের[২১] যাঁতাকলে পিষ্ট মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল। এ দেশের মানুষ স্বপ্ন দেখেছিলেন জনকল্যাণমুখী একটি রাষ্ট্রের– যে রাষ্ট্রে নিশ্চিত হবে চয়নের স্বাধীনতা (freedom of choice): অবারিত হবে অর্থনৈতিক সুযোগ, উন্মেষিত হবে সামাজিক সুবিধাদি, পাওয়া যাবে রাজনৈতিক মুক্তি, থাকবে স্বচ্ছতা ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা, পাওয়া যাবে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক মানস কাঠামো বিনির্মাণের পরিবেশ, প্রস্ফুটিত হবে ধর্ম নিরপেক্ষ আচরণ। স্বাধীন রাষ্ট্রের সংবিধান (১৯৭২) এসবের অঙ্গীকার করে, প্রকাশ্যে; করে মৌলিক চাহিদা মেটানো থেকে শুরু করে নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমানাধিকারের অঙ্গীকারও। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এ অঙ্গীকার, আর বাস্তবের ফারাক এতই বেশি যার ভিতরে মৌলবাদের অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিবাদী রাজনীতির বিস্তৃতি সম্ভব।

---

[২১] পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে দুই অর্থনীতির এই বৈষম্যের সাধারণ রূপ নিয়ে ১৯৬৬ সালে "সোনার বাংলা শ্মশান কেন"(?) শিরোণামে যে প্রচারপত্র পূর্ব পাকিস্তানে বিলি করা হয়েছিলো সেখানে স্পষ্ট লেখা ছিলো: রাজস্ব খাতের মোট বার্ষিক ব্যয় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে ৫,০০০ কোটি টাকা আর পূর্ব পাকিস্তানে ১,৫০০ কোটি টাকা, উন্নয়ন খাতে পশ্চিম পাকিস্তানের বরাদ্দ ছিল ৬,০০০ কোটি টাকা আর পূর্ব পাকিস্তানে ৩,০০০ কোটি টাকা, মোট বৈদেশিক সাহায্যের ৮০ শতাংশ পেতো পশ্চিম পাকিস্তান আর বাকি মাত্র ২০ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তান, বৈদেশিক মুদ্রা আমদানিতে পশ্চিম পাকিস্তানের অংশ ছিলো ৭৫ শতাংশ আর পূর্ব পাকিস্তানের ২৫ শতাংশ, কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরিতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অংশ ছিল ৮৫ শতাংশ আর বাদবাকি ১৫ শতাংশ ছিল পূর্ব পাকিস্তানিদের, আর সামরিক বিভাগের চাকুরিতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অংশ ছিল ৯০ শতাংশ আর বাদবাকি মাত্র ১০ শতাংশ ছিলো পূর্ব পাকিস্তানিদের জন্য।

৫. ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের অর্থনীতি: ভিত্তি, প্রকৃতি, মাত্রা

বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনৈতিক ভিত দুর্বল নয়। তার কারণ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সামন্তবাদী উৎপাদন সম্পর্ক ক্ষয় হয়েছে, কিন্তু একদিকে যেমন চিরাচরিত সামন্তবাদী মানস কাঠামো বিলুপ্ত হয়নি তেমনি অন্যদিকে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কও বিকশিত হয়নি; বিকশিত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের নিকৃষ্ট পুঁজি যা উৎপাদনশীল বিনিয়োগে ভূমিকা রাখে না; সৃষ্টি হয়েছে নিজেরা সম্পদ সৃষ্টি না করে অন্যদের সম্পদ দখল-বেদখল-জবরদখলকারী ফাও-খাওয়া-লুটেরা-পরজীবী এক রেন্ট-সিকার (rent-seeker) গোষ্ঠী যারাই আবার বিভিন্ন পথ-পদ্ধতির মাধ্যমে সরকার ও রাজনীতিকেও তাদের অধীন সত্তায় রূপান্তরিত করে ফেলেছে। উল্লেখ্য যে এসব রেন্ট-সিকার গোষ্ঠী সৃষ্টিসহ "ব্রিফকেস পুঁজিবাদ" বিকাশে শিল্প-ভিত্তিক চিরায়ত পুঁজিবাদের তুলনায় "শকুন পুঁজিবাদ" (vulture capitalism) অনেক বেশি অনুকূল। এই পুঁজিবাদ উৎপাদনশীল শিল্প নির্ভর অর্থনীতির চেয়ে নগরভিত্তিক ভূমি-ব্যবসা এবং দোকানদারী অর্থনীতি বিকাশে অনেক বেশি উৎসাহী। অর্থাৎ কাঠামোগতভাবেই এই পদ্ধতি উদ্বৃত্ত শ্রমের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারছেনা। হচ্ছে না দারিদ্র্য বিমোচন[২২]। অবশ্য এ ধরনের মুক্তবাজার অর্থনীতি কখনোই দরিদ্র-বান্ধব নয়। একচেটিয়া পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের মুক্তবাজার এদেশের জাতীয় পুঁজি-ভিত্তিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার বদলে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে তাও মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতা পুষ্টিতে সহায়ক।

কাঠামোগত রূপান্তরের নিরিখে স্বাধীনতা উত্তর গত চার দশকে (১৯৭৫-২০১৫) বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এমন কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি যা দিয়ে বলা যাবে যে, স্বাধীনতার মানবকল্যাণমুখী চেতনা বাস্তবায়িত হয়েছে। সুস্থ-সবল-চেতনাসমৃদ্ধ ভেদহীন মানুষ সৃষ্টিই ছিল স্বাধীনতার মূল আকাঙ্ক্ষা। সে আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতার দূরত্ব ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান। আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতার ক্রমবর্ধমান এ ফারাকটাও মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্ব তোষণে সহায়ক।

দুই অর্থনীতির বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে এ কথা সত্য। তবে গত চার দশকের (১৯৭৫-২০১৫) বিকাশের ধারা ১৬ কোটি মানুষের আমাদের দেশকে সুস্পষ্টভাবে দু'ভাগে বিভাজিত করেছে: প্রথম ভাগে আছেন সংখ্যালঘু ক্ষমতাধর মানুষ, যাদের সংখ্যা হবে বড়জোর ১০ লক্ষ; আর দ্বিতীয় ভাগে আছেন সংখ্যাগুরু ক্ষমতাহীন মানুষ, যাদের সংখ্যা হবে ১৫ কোটি ৯০ লক্ষ। রাজনীতি-অর্থনীতির মারপ্যাচে সৃষ্টি হয়েছে এমন এক অবস্থা যেখানে ১০ লক্ষ ক্ষমতাধরের বিপরীতে আছেন ১৫ কোটি ৯০ লক্ষ ক্ষমতাহীন, অসহায়, দুর্দশাগ্রস্ত, বঞ্চিত, বৈষম্য-জর্জরিত, হতাশাগ্রস্ত মানুষ। প্রকৃত অর্থে এই বিশাল সংখ্যক ক্ষমতাহীন মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি অথবা ক্ষমতাহীনদের ক্ষমতায়ন অথবা inclusion of the excluded– এ বিষয়ে অন্তত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-সামাজিক কর্মকাণ্ডের নিরিখে সচেতন কোনো প্রয়াস কখনও বাস্তবায়িত হয়নি। উল্টো,

[২২] দারিদ্র্য বিষয়ে অর্থনীতিবাদীদের ধারণা যথেষ্ট সংকীর্ণ। অর্থনীতিবাদীরা দারিদ্র্য সংজ্ঞায়ন করেন সাধারণত আয় অথবা খাদ্য পরিভোগের নিরিখে। যে দারিদ্র্য মৌলবাদ বিকাশের উর্বর ক্ষেত্র সৃষ্টি করে তার মর্ম অনুধাবন করতে হলে দারিদ্র্যকে দেখতে হবে দারিদ্র্যের সকল পরস্পর সম্পর্কিত জটিল রূপ সমষ্টির সমগ্রকতা দিয়ে। দারিদ্রের ঐসব রূপ হল: আয়ভিত্তিক দারিদ্র্য, ক্ষুধা জনিত দারিদ্র্য, স্বল্প মজুরীর কারণে দারিদ্র্য, বেকারত্বজনিত দারিদ্র্য, শিক্ষার দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যের দারিদ্র্য, আশ্রয়হীনতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, ব্যক্তিগত নিরাপত্তাহীনতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, বিভিন্ন ধরনের প্রান্তিকতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, (যেমন ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষ, আদিবাসী মানুষ, দরিদ্র নারী, বস্তিবাসী, চরের মানুষ, রিক্সা-ভ্যান-ঠেলাগাড়ি চালক ইত্যাদি), সর্বোপরি মানস কাঠামোর দারিদ্র্যসহ সাংস্কৃতিক মুল্যবোধের দারিদ্র্য (বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, ২০০৬, একজন অদরিদ্রের দারিদ্র্য চিন্তা) ।

ক্ষমতাবানদের ক্ষমতা বৃদ্ধির বহুমুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, তা আরও বহুদিন বহাল থাকবে। সামগ্রিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমীকরণ তা-ই নির্দেশ করে। আর ভারসাম্যহীন বিকাশ সমীকরণে এক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যদি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী "মুক্তির পথে" সুইসাইড বোমারু হিসেবে 'বেহেশতবাসী' হবার জন্য আত্মাহুতি দেয় তা অযৌক্তিক হবে কেনো?

এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষমতাহীন মানুষ (কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার সূচক-সংক্রান্ত সরকারি পরিসংখ্যান যা-ই বলুক না কেন) অতিকষ্টে জীবন যাপন করছেন– "পরিসংখ্যানিক অর্থনীতি (statistical economy) যা-ই বলুক না কেনো এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এদেশে মোট জাতীয় আয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠির হিস্যা উত্তরোত্তর কমেছে, আর রেন্ট-সিকার ধনীদের বেড়েছে– ধনী-দরিদ্র ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের একথা সরকারিভাবেই স্বীকৃত। অর্থাৎ সহজ কথায়– বৈষম্য-অসমতা ক্রমবর্ধমান। মনে রাখা প্রয়োজন যে গত ৪০ বছরে এ দেশে বিভিন্ন মানদণ্ডে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৫ কোটি থেকে বেড়ে এখন ১০ কোটিতে দাঁড়িয়েছে; আর সেই সাথে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি। বিকাশ প্রবণতা যা তাতে দেখা যায় নিকট অতীতের দরিদ্ররা দরিদ্রই থাকছেন, আর নিম্নবিত্ত হচ্ছেন দরিদ্র, সেই সাথে মধ্য-মধ্যবিত্তের ব্যাপক অংশ হয় নিম্ন-মধ্যবিত্তে অথবা এক লাফে দরিদ্র্যে রূপান্তরিত হচ্ছেন। একই সময়ে অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রশাসন, আর শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রসহ সর্বত্র এক আত্মঘাতী লুণ্ঠন সংস্কৃতি (self destructing culture of plundering) জেঁকে বসেছে। এই লুণ্ঠন সংস্কৃতির চরিত্র-নিয়ামক হ'ল কালো টাকা, সন্ত্রাস, অবৈধ অস্ত্র, পেশি শক্তি, ঘুষ, দুর্নীতি, কুশাসন-অপশাসন, দমন-পীড়ন ইত্যাদি। এসবই ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও মৌলবাদের অর্থনীতি গঠনের সহায়ক উপাদান। আর এ প্রক্রিয়া ত্বরান্বয়নে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদসহ পাকিস্তান ফ্যাক্টর থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট বহিঃস্থ উপাদান সক্রিয় প্রভাবকের ভূমিকা পালন করছে।

গত চার দশকে এদেশে আর্থ-সামাজিক বিকাশে মূল প্রবণতা হ'ল: ১০ লক্ষ দুর্বৃত্ত ১৫ কোটি ৯০ লক্ষ সাধারণ মানুষকে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোর মধ্যে জিম্মি করে রেখেছে। ক্ষমতাধর সংখ্যালঘিষ্ঠ রেন্ট-সিকার দুর্বৃত্ত ও দুর্বৃত্তায়নের শিকার ক্ষমতাহীন সংখ্যাগুরু এ দু'টি ধারা স্পষ্টতই বিরাজ করছে।

মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতির উদ্ভব ও বিকাশ সহায়ক গত চার দশকের খেরোখাতা (সারণি ১ দ্রষ্টব্য) যে চিত্র দেখায়, তাতে স্পষ্ট যে, যা কিছু মানবকল্যাণবিমুখ ও মানব উন্নয়ন বিরোধী অর্থাৎ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী সেগুলো উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধি লাভ করেছে; মনুষ্য সম্পর্কসহ সবকিছুই বাজারি পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে; প্রান্তস্থ আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নেতৃত্বের অভাবে উৎপাদনশীল ও জনকল্যাণমুখী ভিত্তি সম্প্রসারিত হতে পারেনি। উন্নয়নের খেরোখাতা দেখাচ্ছে যে, যা বৃদ্ধি পেলে সকলের জন্যই মঙ্গল হতো, তা বৃদ্ধি পায়নি, হ্রাস পেয়েছে, আর যা হ্রাস পেলে ভাল হত, তা দ্রুতহারে বেড়েছে: গত চার দশকে কিছু মানুষ অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছেন আর ব্যাপক জনগোষ্ঠী নিঃস্ব হয়েছেন (আর নিঃস্ব মানুষ আশ্রয় খোঁজেন); সম্পদের উৎপাদনশীল বিনিয়োগ হয়নি, অনুপার্জিত আয় অধিক হারে অনুপার্জিত আয়ের উৎস খুঁজেছে; কিছু মানুষের জৌলুস বেড়েছে আর ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনা-দুর্দশা সম্প্রসারিত হয়েছে; উঠেছে বহুতল ভবন, বেড়েছে বস্তি। সরকারি প্রকৃত ব্যয় বরাদ্দ জনকল্যাণে কমেছে, বেড়েছে অনুৎপাদনশীল খাতে; বেড়েছে বৈদেশিক খবরদারি, কমেছে দেশজ স্থানীয় উদ্যোগ; বেড়েছে অনুৎপাদনশীল খাতে সরকারি ব্যয়-বরাদ্দ, সেই সঙ্গে বেড়েছে পাবলিকের সঙ্গে পাবলিক সার্ভেন্টদের দূরত্ব; বেড়েছে নির্বাচনী ব্যয়, কমেছে সুশাসন আর নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা; বেড়েছে কালো

সারণি ১: মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক উদ্ভব-সহায়ক গত চার দশকের খেরোখাতা, ১৯৭৫-২০১৪

বৃদ্ধির প্রবণতা	হ্রাসের প্রবণতা
কালো অর্থনীতি/কালো টাকা এবং সংশ্লিষ্ট লুণ্ঠন, অপরাধ, সন্ত্রাস, অবৈধ অস্ত্র, পেশিশক্তি, দুর্নীতি, ঘুষ, হুণ্ডি, কুশাসন-অপশাসন, দমন-নিপীড়ন, খুন, জখম, রাহাজানি	শক্তিশালী অর্থনীতির ভিত; জাতীয় পুঁজির বিকাশ; শিল্পায়ন; সাধারণ মানুষের মানবিক জীবন পরিচালন-সক্ষমতা; কর্মসংস্থান; কালো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিরুৎসাহিত করার প্রতিষ্ঠান-সমূহের কার্যকারিতা
কোটিপতি ও ভিক্ষুক/নিঃস্বায়িত মানুষ; জোরপূর্বক ভূমি-জলাশয় দখল; নতুন গাড়ি-ফাট ও ভিক্ষাবৃত্তির নবতর কৌশল; যাকাতের কাপড় সংগ্রহে মৃতের সংখ্যা; শৈত্যপ্রবাহ ও গ্রীষ্মদাহে অসুস্থ ও মৃতের সংখ্যা	অর্থনৈতিক সুযোগ; কর্মসংস্থানের সুযোগ (মানব উন্নয়নের প্রথম শর্ত); সম্পদের প্রতি সাধারণ মানুষের অভিগম্যতা/ মালিকানা
গ্রাম থেকে শহরে আসা মানুষ; বস্তিবাসীর সংখ্যা; ইনফর্মাল সেক্টর; নিউকিয়ার পরিবার; শিশু-মহিলা ও প্রবীণদের দুর্দশা-বঞ্চনা	ভূমিহীনতা ও গ্রামে কর্মসংস্থান; প্রকৃত আয়/মজুরি; সম্প্রসারিত (বর্ধিত) একান্নবর্তী পরিবার
বৈধ-অবৈধ আমদানি ও রপ্তানি; অনুপার্জিত আয়; ভারসাম্যহীন অর্থনৈতিক উন্নয়ন	মানবশক্তি ও সম্পদের কার্যকর ব্যবহার; জাতীয় পুঁজির শিল্পখাতে বিকাশ; ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ
বৈদেশিক ঋণ-অনুদান প্রকল্প; এনজিও কার্যক্রম	দেশজ ও স্থানীয় উদ্যোগ; স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারে প্রণোদনা ও আগ্রহ; সামাজিক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ
তথ্য প্রযুক্তির প্রসার ও যোগাযোগ; কম্পিউটার ও ব্যবসা শাস্ত্রের ছাত্র সংখ্যা	সাধারণ বিজ্ঞান চর্চা; প্রযুক্তিগত ভিত্তি ; বিজ্ঞান-দর্শনের ছাত্র সংখ্যা
ব্যক্তিমালিকানাধীন বাণিজ্যিক-ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, কোচিং সেন্টার, ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, কিন্ডার গার্টেন, মাদ্রাসা (ইংরেজি মিডিয়ামসহ); শিক্ষায় ধনী-দরিদ্র বৈষম্য	সাধারণ মানুষের জন্য সরকারি/বেসরকারি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়; শিক্ষার গুণগতমান; শিক্ষা ব্যবস্থার ফলপ্রদতা; মৌলিক শিক্ষাখাতে সরকারের প্রকৃত ব্যয়-বরাদ্দ
ধর্ম ব্যবসা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, পীর-ফকিরের সংখ্যা, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি, ধর্মের নামে সহিংসতা, ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি বিতৃষ্ণার প্রকাশ ; ভাগ্য বিশ্বাস; জ্যোতিষির সংখ্যা	ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি সম-শ্রদ্ধাবোধ; বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান; বিজ্ঞান মনস্কতা; বিজ্ঞান চর্চা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ভিত্তিক সাধারণ আলোচনাসভা; সুস্থ জীবনবোধ; ধর্মনিরপেক্ষ আচরণ ও মানস-কাঠামো
ব্যয়বহুল বেসরকারি কিনিক, ডায়াগনোস্টিক সেন্টার; দুশ্চিন্তা ও দারিদ্র উদ্ভুত অসুখ-বিসুখ; চিকিৎসা ব্যয়; চিকিৎসা ব্যয়-উদ্ভুত নিঃস্বায়ন	প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার অবকাঠামো; সরকারি স্বাস্থ্য খাতে চিকিৎসার মান; স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু প্রকৃত ব্যয়; সরকারি স্বাস্থ্য খাতের কার্যকারিতা
অপসংস্কৃতি চর্চা; অপ-সংস্কৃতি শ্রবণ-দর্শনে সময়ের অপচয়; মানুষে-মানুষে অবিশ্বাস	দেশজ সংস্কৃতির চর্চা; সংহতি বোধ; পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ; মানবিক মূল্যবোধ
রাজনৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়; রাজনীতিবিদ-দের দালালি; রাজনীতিকে ব্যবসায়ী পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা; স্বৈরশাসন; জনকল্যাণকামী ধারার রাজনৈতিক চেতনার চাহিদা	জনগণের প্রতি রাজনীতিবিদদের মমত্ববোধ; জ্ঞান ও আদর্শভিত্তিক রাজনীতি; রাজনীতিবিদদের দেশপ্রেম; গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ

উৎস: প্রবন্ধকার কর্তৃক বিনির্মিত।

টাকার দাপট, কমেছে জনগণের প্রতি রাজনীতিবিদদের মমত্ববোধ। বেড়েছে শিক্ষায় ধনী-দরিদ্র বৈষম্য, কমেছে মৌলিক শিক্ষাখাতে সরকারি প্রকৃত ব্যয় বরাদ্দ; বেড়েছে দারিদ্র-উদ্ভূত অসুখ-বিসুখ এবং চিকিৎসা ব্যয় উদ্ভূত নিঃস্বায়ন, কমেছে সরকারি স্বাস্থ্য খাতের কার্যকারিতা; বেড়েছে ধর্ম-ব্যবসা, হতাশা-নিরাশা, পীর-ফকিরের সংখ্যা, জ্যোতিষির সংখ্যা, ভাগ্যবিশ্বাস, ধর্মের নামে সহিংসতা, আর কমেছে ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, বিজ্ঞান চর্চা, ধর্মনিরপেক্ষ আচরণ ও অসাম্প্রদায়িক মানস কাঠামো– এক কথায় সুপ্রশস্ত হয়েছে সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকীকরণের ভিত্তি। এসবের পাশাপাশি শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ মৌলবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধিতে সরাসরি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে: গত তিন দশকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ আর দাখিল মাদ্রাসা বেড়েছে ৮ গুণ; প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী বেড়েছে দ্বিগুণ আর দাখিল মাদ্রাসায় বেড়েছে ১৩ গুণ; সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক পর্যায়ে একজন ছাত্র/ছাত্রীর মাথাপিছু রাষ্ট্রীয় ব্যয় যেখানে ৩,০০০ টাকা, সরকারি মাদ্রাসা খাতে তা ৫,০০০ টাকা।

মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ হবে যে, বাংলাদেশে এখন প্রতি ৩ জন ছাত্রের ১ জন মাদ্রাসার ছাত্র (যার মোট সংখ্যা হবে ৮০ লক্ষ); দেশে মোট মাদ্রাসার সংখ্যা হবে ৫৫,০০০-এর বেশি, যার মধ্যে ৭৩ শতাংশ কওমি মাদ্রাসা; এসব মাদ্রাসা পরিচালনে বছরে ব্যয় হয় আনুমানিক ১,৪০০ কোটি টাকা, আর মাদ্রাসা পাশদের মধ্যে বেকারত্বের হার ৭৫ শতাংশ।[২৩] শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণের অভিঘাত ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে এ কথাও বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে যে অধিকাংশ মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা কিন্তু স্বল্পবিত্ত-দরিদ্র পরিবার থেকে আগত। উগ্র সাম্প্রদায়িক জঙ্গি আত্মঘাতী বোমাবাজদের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই ধরনের ধারণা-কাঠামো প্রযোজ্য।

অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন এবং গরীব ও মধ্যবিত্তের স্বার্থবিরোধী রাজনৈতিক-অর্থনীতি নির্ভর উন্নয়ন ধারা বাংলাদেশে গ্রাম ও শহর অঞ্চলের শ্রেণি কাঠামো বদলে দিয়েছে। আর্থ সামাজিক শ্রেণি কাঠামো যেভাবে বদলেছে তা সাম্প্রদায়িক জঙ্গিত্ব ও মৌলবাদ বিকাশের অনুকূল। বাংলাদেশে চলমান আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোর পরিবর্তনের এই ধরন সামগ্রিকভাবে দারিদ্র এবং মধ্যবিত্তের বেহাল দশাকেই নির্দেশ করে। শ্রেণি কাঠামোর পরিবর্তনের এ ধারাটি গুটি কয়েক ধনিক শ্রেণির হাতে সম্পদ ও ক্ষমতা পুঞ্জিভূত হওয়ার বিষয়টিও স্পষ্টতর করে। নিচের বৈশিষ্টগুলো আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামো পরিবর্তন প্রবণতার সে চিত্রটিই তুলে ধরে যা দিয়ে ধর্মীয় উগ্রবাদ এবং মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতির বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ সম্ভব (সারণি ২)।

১. আমার হিসেবে বাংলাদেশে এখন ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে ১০ কোটি ৫৫ লক্ষ মানুষ দরিদ্র (৬৬%), ৫ কোটি ১ লক্ষ মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণির (৩১.৩%) এবং অবশিষ্ট ৪৪ লক্ষ মানুষ (২.৭%) ধনী। গত ত্রিশ বছরে (১৯৮৪-২০১২) দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪ কোটি ৫৫ লক্ষ (১৯৮৪ সালে ৪ কোটি থেকে ২০১২ সালে ১০ কোটি ৫৫ লক্ষ)। দরিদ্র জনসংখ্যার এই বৃদ্ধি জাতীয় উন্নয়নের ব্যর্থতারই বহিঃপ্রকাশ। যা বাংলাদেশে ধর্মের প্রভাব এবং ধর্মীয় উগ্রতাকে উৎসাহিত করার ভিত্তি মজবুত করেছে।

২. শহরের তুলনায় গ্রামে দরিদ্র শ্রেণির মানুষের সংখ্যা অনেকগুণ বেশি। দেশের মোট দরিদ্র মানুষের ৮২ শতাংশ গ্রামে এবং ১৮ শতাংশ শহরে বাস করেন। গ্রামে বসবাসকারী ৬০ শতাংশ খানা

[২৩] আবুল বারকাত ও অন্যান্য, ২০০৮, Political Economy of Madrassa Education in Bangladesh: Genesis, Growth and Impact.

সারণি ২: বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক শ্রেণির গতি প্রবণতা, ১৯৮৪-২০১২

গ্রাম/শহর	দরিদ্র		মধ্যবিত্ত								ধনী		সর্বমোট	
			নিম্ন		মধ্য		উচ্চ		মোট					
	১৯৮৪	২০১২	১৯৮৪	২০১২	১৯৮৪	২০১২	১৯৮৪	২০১২	১৯৮৪	২০১২	১৯৮৪	২০১২	১৯৮৪	২০১২
গ্রাম (ভূমি মালিকানাভিত্তিক)														
% গ্রামীণ জনসংখ্যা	৬৩	৭১	১৬.৯	১৬	১১.৬	৮	৪.৭	৩	৩৩.২	২৭	৩.৮	২.০	১০০	১০০
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	৫৩	৮৬.৩	১৪	১৯.৫	১০	৯.৭	৪	৩.৬	২.৮	৩২.৮	৩	২.৪৩	৮৪	১২১.৬
শহর (সম্পদ মূল্যভিত্তিক)														
% শহরের জনসংখ্যা	৪৫	৫০	৩০	২০	২০	১৫	৩	১০	৫৩	৪৫	২	৫	১০০	১০০
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	৭	১৯.২	৫	৭.৭	৩	৫.৮	০.৫	৩.৮	৮.৫	১৭.৩	০.৩	১.৯২	১৬	৩৮.৪
মোট (গ্রাম+শহর)														
% মোট জনসংখ্যা	৬০	৬৬	১৯	১৬.৯	১৩	৯.৭	৪.৫	৪.৭	৩৬.৫	৩১.৩	৩.৩	২.৭	১০০	১০০
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	৬০	১০৫.৫	১৯	২৭.১	১৩	১৫.৬	৪.৫	৭.৫	৩৬.৫	৫০.১	৩.৩	৪.৪	১০০	১৬০

উৎস: আবুল বারকাত, ২০১৫, A Political Economy Treatise on Religious Fundamentalism and Extremism: A high probability global catastrophe with reference to Bangladesh, পৃ: ১৩।

পদ্ধতিগত ধারণা: বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোকে চিহ্নিত করার জন্য সরকারিভাবে কোনো গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি নেই। এক্ষেত্রে লেখক দেশের সমাজ কাঠামোর গতি পরিবর্তনের ধারা বোঝার জন্য বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক শ্রেণির জনসংখ্যা পরিমাণ নির্ধারণে একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। মানদণ্ড হিসেবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বসত ভিটার মালিকানা ও শহরের মানুষের সম্পদের মূল্যমানকে ধরা হয়েছে। শ্রেণিকরণের এই পদ্ধতি যেভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে তা হচ্ছে: গ্রামীণ এলাকায় বিত্তহীন অথবা কম সম্পদশালী শ্রেণি– যাদের জমির পরিমাণ ১০০ শতক পর্যন্ত এবং শহরের যেসব মানুষের মোট সম্পদের দাম ৫ লক্ষ টাকার কম, নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে তাদের ধরা হয়েছে যেসব গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জমির মালিকানা ১০১ থেকে ২৪৯ শতক এবং শহরের মানুষের ক্ষেত্রে যাদের সম্পদের দাম ৫ লক্ষ থেকে ৯ লক্ষ টাকা পর্যন্ত; গ্রামের মধ্য-মধ্যবিত্ত বিবেচিত হয়েছে ২৫০-৪৯৯ শতক জমির মালিকরা এবং শহরে ধরা হয়েছে যাদের সম্পদের মূল্য ১০ থেকে ২৯ লক্ষ টাকা; গ্রামের যেসব জনগোষ্ঠির সম্পদের পরিমাণ জমির মালিকানা ৫০০ থেকে ৭৪৯ শতক তারা উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং শহরের ক্ষেত্রে উচ্চ মধ্যবিত্ত ধরা হয়েছে তাদের যাদের সম্পদের মূল্য ৩০ লক্ষ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। ধনী (উচ্চবিত্ত) হিসেবে বিবেচিত হয়েছে গ্রামের ক্ষেত্রে ৭৫০ শতক বা তার বেশি জমির মালিকরা এবং শহরের ক্ষেত্রে ৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব সম্পদশালীদের।

ভূমিহীন। ৭০ ভাগ খানাতে এখনও পর্যন্ত বিদ্যুৎ সংযোগ নেই (মনে রাখা দরকার বিদ্যুৎ মানে বালবের আলো নয় বিদ্যুৎ মানে আলোকিত মানুষ গড়ার মাধ্যম)। শতকরা ৬৫ জন সরকারি স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশে নগরায়ন মুলত বস্তিয়ায়ন অথবা শহুরে জীবনের গ্রামায়ন। এ নগরায়নের পাশাপাশি শিল্পায়ন হয়নি বললেই চলে; যা হয়েছে তা হলো অনানুষ্ঠানিক খাতের বিস্তৃতি এবং সংশ্লিষ্ট হতাশা-নিরাশা-দুর্দশা-বঞ্চনা। গ্রাম ও শহরের এই প্রকৃতির দারিদ্র্য ধর্মীয় উগ্রতাসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড উৎপত্তির জন্য সহায়ক ভিত্তিভূমি।

৩. বিগত ৩০ বছরে (১৯৮৪-২০১২) দেশের মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৬০ শতাংশ। অথচ বিত্তহীন জনসংখ্যাবৃদ্ধির পরিমাণ ৭৬ শতাংশ। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে দারিদ্র্য-তাড়িত মৌলবাদের বৃদ্ধির পরিমাণও গত ত্রিশ বছরে আনুপাতিকহারে বেশি।

৪. মধ্যবিত্ত শ্রেণির ধারক বর্তমানে ৫ কোটি ৭১ লক্ষ মানুষ যার মধ্যে ২ কোটি ৭১ লক্ষ নিম্নমধ্যবিত্ত (যারা মোট মধ্যবিত্তের ৫৪ শতাংশ), ১ কোটি ৫৬ লক্ষ মধ্য-মধ্যবিত্ত (মোট মধ্যবিত্তের ৩১ শতাংশ) এবং অবশিষ্ট ৭৫ লক্ষ উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত। এই মধ্যবিত্ত (যারা মোট মধ্যবিত্তের ১৬ শতাংশ) এই শ্রেণির বিশেষত অস্থির-অস্থিতিশীল নিম্ন ও মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণি (যারা মোট জনসংখ্যার ৪৩ শতাংশ আর মোট মধ্যবিত্তের ৮৫ শতাংশ মানুষ) থেকে মৌলবাদের মেধাশক্তি গঠিত হয়। ধর্মীয় মৌলবাদের সাফল্যের মূল চাবিকাঠিও এদের কব্জায়।

এদেশে বিগত ত্রিশ বছরে (১৯৮৪-২০১২) শ্রেণি কাঠামোর পরিবর্তন যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি করেছে তা মৌলবাদের শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক। বিশ্লেষণ যা বলছে তা হলো নিম্নরূপ:

ক. বিগত ৩০ বছরে বর্ধনশীল জনগোষ্ঠীর ৭৬ শতাংশই দরিদ্র আর ১৪ শতাংশ মূলত অতীতের নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে আগত।

খ. গ্রামের তুলনায় শহরে মধ্যবিত্তের concentration বেশি। তবে নিরঙ্কুশ সংখ্যার হিসেবে দেশের মোট মধ্যবিত্তের প্রায় ৬৬ শতাংশের আবাস এখনও গ্রামে (যাদের ৫৯ ভাগ নিম্নমধ্যবিত্ত)।

গ. বিগত ৩০ বছরে মধ্যবিত্ত জনসংখ্যার পরিমাণ বেড়েছে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ (১৯৮৪ সালে ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ থেকে ২০১২ সালে ৫ কোটি ১ লক্ষ)। মধ্যবিত্তে বর্ধমান শতকরা ৬০ ভাগ জনসংখ্যা গঠিত হয়েছে নিম্নমধ্যবিত্ত গ্রুপে বৃদ্ধির কারণে। এই প্রবণতা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণিকে উপরে উঠতে দেয় না আর মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে নিম্নমধ্যবিত্তের দিকে তাড়িত করে।

ঘ. বিগত ৩০ বছরে যখন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের সংখ্যা বেড়েছে ৩৭ শতাংশ ঠিক একই সময়ে নিম্ন-মধ্যবিত্তের বৃদ্ধির হার ৪৩ শতাংশ আর অতীতের নিম্নমধ্যবিত্তদের এক বৃহৎ অংশ দরিদ্র গ্রুপে যোগ দিয়েছে। বিত্তের এ অধোগতি নিঃসন্দেহে মানুষকে করেছে অদৃষ্টবাদী।

ঙ. ২০১২ সালে ধনী (উচ্চ শ্রেণি) জনসংখ্যা ৪৪ লক্ষ। বিগত ৩০ বছরে নবসংযোজিত ধনীর সংখ্যা ১ কোটি ১ লক্ষ। অর্থাৎ ১৯৮৪ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ধনিক শ্রেণির বৃদ্ধি হয়েছে ৩৩ শতাংশ। সম্পদ যে পুঞ্জিভূত হয়েছে কিছু হাতে এবং বৈষম্য বেড়েছে তার অন্যতম প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে মোট জনসংখ্যায় ধনীর সংখ্যা হ্রাস: ১৯৮৪ সালে ৩.৩ শতাংশ থেকে

২০১২ সালে ২.৭ শতাংশে। অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন এবং কালো অর্থনীতির গবেষণায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ধনীর মধ্যে একটা সংখ্যালঘুদল সৃষ্টি হয়েছে যারা "সুপার ধনী' (super-duper rich) অথবা অন্যভাবে বলা যায়, এদের মধ্যে ২০ শতাংশ ধনী সমগ্র ধনিক শ্রেণির সম্পদের ৮০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে। অর্থাৎ বিগত ত্রিশ বছরে বাংলাদেশে ধনী-দরিদ্রের যে ব্যবধান ক্রমবর্ধমান তাতে করে অতি-ধনী (যাদের বলে super-duper rich) রেন্ট-সিকারদের যে গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে তা থেকে বাংলাদেশের সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্রকে "For the 1%, of the 1%, by the 1%" নামে আখ্যায়িত করা যায়। মালিকানার বৈষম্য-অসমতাজনিত যে কাঠামো গড়ে উঠেছে তা শুধুমাত্র দারিদ্র্য-অসমতাকে চিরস্থায়ী করেছে তা-ই নয় তা ধর্মীয় মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিবাদ চিরস্থায়ীকরণের উর্বর ভূমি প্রস্তুত করছে– এ বিষয়ে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোর বিকাশ প্রবণতা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, গত ৩০ বছরে বাংলাদেশের সার্বিক দারিদ্র অবস্থার অধোগতি হয়েছে। সেই সাথে দেখা যাচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিম্নগামী প্রবণতা এবং মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিম্ন-মধ্যবিত্তের দিকে ধাবিত হওয়া, নিম্ন-মধ্যবিত্তের গতি দরিদ্রমুখী আর সম্পদ পুঞ্জিভূত হচ্ছে কিছু ধনিক শ্রেণির মানুষের হাতে (যারা মোট জনসংখ্যার ২.৭ শতাংশ, আবার যাদের ২০ শতাংশ দখল করে আছে ধনীদের ৮০ শতাংশ সম্পদ)। এক দিকে এই প্রকট গণদারিদ্র্য এবং ব্যাপক অসমতা আর অন্যদিকে মধ্যবিত্তের অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা এবং নগণ্য সংখ্যক মানুষের হাতে অঢেল সম্পদ– এসবই বাংলাদেশে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাসহ উগ্র মৌলবাদ উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের শক্তিশালী অনুকূল পরিসর সৃষ্টি করেছে।

সুতরাং বিশ্লেষণে এ উপসংহারে উপনীত হওয়া সম্ভব যে যদিও কয়েক শতাব্দীর ঐতিহাসিক বিকাশ এ দেশে অর্থনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে না তথাপি গত প্রায় ৭ দশকের (১৯৪৭ সালে ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমসাময়িককাল থেকে) মানব কল্যাণবিমুখ উন্নয়ন ধারা মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ়করণের সকল শর্ত সৃষ্টি ও সম্প্রসারিত করেছে। আর বিশ্বায়নসহ বহিঃস্থ অনেক উপাদানই (external factors) এ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করেছে।

৬. মৌলবাদের অর্থনীতি: গঠন প্রক্রিয়া, বিস্তৃতি ও সম্ভাবনা

আগেই বলেছি স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার জনকল্যাণকামী রাজনৈতিক শক্তির কাঙ্ক্ষিত বিকাশ ত্বরান্বিত হয়নি। রাষ্ট্রক্ষমতায় ঘুরে ফিরে এসেছে স্বৈরতন্ত্র অথবা কালো টাকার স্বার্থবাহী সংসদ। দুর্বৃত্তায়িত হয়েছে অর্থনীতি, আর তা রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের কার্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি করেছে। অর্থনীতি ও রাজনীতির এ দুর্বৃত্তায়নের হোতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে পরসম্পদ লুণ্ঠনকারী-পরজীবীদের দল– Rent Seekers, যারা আবার সরকার ও রাজনীতিকে তাদের অধীন দাস-সত্তায় পরিণত করেছে। এসবই বঙ্গবন্ধু হত্যা-পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতির মর্মবস্তু।

আমাদের দেশে রেন্ট-সিকার নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের নির্দেশকসমূহ নিম্নরূপ: গত চার দশকে (১৯৭৫ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত) বাংলাদেশে সরকারিভাবে যে প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক ঋণ-অনুদান এসেছে তার ৭৫ শতাংশ লুট করেছে দুর্বৃত্তরা (যাদের সংখ্যা আসলে ২ লক্ষ আর পরিবার-পরিজনসহ ১০ লক্ষ মানুষ); এরা এখন বছরে প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকার

সমপরিমাণ কালো টাকা সৃষ্টি করে (যার ক্রমপুঞ্জীভূত পরিমাণ হবে ৬-৭ লক্ষ কোটি টাকা[২৪]), এরাই বছরে ৩০-৪০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ অবৈধ অর্থ স্থানান্তরের/পাচারের (money laundering) সাথে সম্পৃক্ত; এরাই বছরে ১৫ হাজার কোটি টাকার ঘুষ-দুর্নীতির সাথে জড়িত; এরাই প্রায় ৩০-৪০ হাজার কোটি টাকার ঋণখেলাপি; এরাই সবধরনের বড় মাপের অবৈধ অস্ত্র ও ড্রাগ ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত; এরা দেশের কমপক্ষে ১ কোটি বিঘা খাস জমি ও জলাভূমি অবৈধভাবে দখল করে আছে; এরাই উপকূলীয় অঞ্চলে বৃহৎ চিংড়িঘের ও ব্যাক্তিগত সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলেছে; যে কোন সরকারি কেনাকাটায় (মূলত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়) অথবা বড় ধরনের বিনিয়োগে এদেরকে কমপক্ষে ২০ শতাংশ কমিশন দিতে হয় ইত্যাদি। আর রেন্ট-সিকার নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের বহিঃপ্রকাশ বহুমুখী– অর্থনীতির দুর্বৃত্তরা তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান এমনভাবে দখল করেন যেখানে সংবিধানের বিধি মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালন অসম্ভব। তারা মূল ধারার ক্ষমতার রাজনীতি ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান-ব্যাক্তিকে ফান্ড করেন; তারা ঘুষ-দুর্নীতিতে পৃষ্ঠপোষকতা করেন; তারা রাষ্ট্রীয় বাজেট বরাদ্দ নির্ধারণ ও তা ভোগ করার বন্দোবস্ত পাকাপোক্ত করেন; তারা লুট করেন সবকিছু– জমি, পানি, বাতাস এমনকি বিচারের রায়; এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতির ধারক-বাহক-প্রভাবক-ত্বরান্বয়ক-উজ্জীবক। তারা ধর্মের লেবাস যত্রতত্র ব্যবহার করেন– স্ব-ধার্মিকতা প্রদর্শনে হেন কাজ নেই যা তাঁরা করেন না; এরা অর্থ-প্রতিপত্তি দিয়ে জাতীয় সংসদের আসন কিনে ফেলেন– তারা জানেন স্থানভেদে ৫ কোটি টাকা থেকে ৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে জাতীয় সংসদের একটি আসন ক্রয়-বিক্রয় সম্ভব এবং সেটা রীতিমতো চর্চা করেন[২৫]। অর্থনীতি ও রাজনীতির এসব দুর্বৃত্তদের প্রতি মানুষের আত্মার গভীরে অনাস্থা আছে; মানুষের সামনে এখন আর রাজনৈতিক 'role model' বলে কিছু নেই– এসব প্রবণতা যে হতাশা-নিরাশা সৃষ্টি করেছে সেগুলোই হয়ে দাঁড়িয়েছে উগ্র সাম্প্রদায়িক মৌলবাদীদের সংগঠন বিস্তৃতির সহায়ক উপাদান।[২৬]

প্রধানত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কারণে মানুষ তথাকথিত গণতন্ত্রী রাজনীতিবিদদের প্রতি আস্থা হারাচ্ছেন-হারিয়েছেন, আর প্রগতির ধারাও সেই সাথে তাল মিলিয়ে বিকশিত হয়নি-হচ্ছে না। মানুষ যখন ক্রমাগত বিপন্ন হতে থাকেন, হতে থাকেন হতাশ ও নিরাশ, মানুষ যখন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থা হারান এবং আস্থাহীনতা যখন নিয়মে পরিণত হয় তখন ব্যাপক সাধারণ জনমানুষ উত্তরোত্তর অধিক হারে নিয়তি নির্ভর– ভাগ্যনির্ভর হতে বাধ্য হন। আর এ নিয়তি নির্ভরতা বাড়ছে কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে যেখানে ৬০ ভাগ কৃষকই এখন ভূমিহীন, যে কৃষি ভিত্তির উপরই এদেশে

---

[২৪] আমার হিসেবে এ পরিমাণ অর্থ দিয়ে মোট ২৫ থেকে ৩০টি পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্ভব; অথবা এ অর্থের মাত্র ২০ শতাংশ ব্যয় করে বাংলাদেশ থেকে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু মোটামুটি দূর করা সম্ভব; অথবা এ অর্থের মাত্র ১০ শতাংশ ব্যয় করে আমাদের দেশ থেকে যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ রোগ চিরতরে উচ্ছেদ করা সম্ভব; অথবা এ অর্থের ৪০ শতাংশ ব্যয় করে সারাদেশে সরকারিভাবে উচ্চতর গুণগত মানসম্পন্ন বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ও প্রাথমিক (দ্বিতীয় স্তরসহ) স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব।

[২৫] এখানে আমাদের জাতীয় সংসদের সদস্যদের পেশা-সংশ্লিষ্ট একটা বিষয় বলা প্রয়োজন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকারে সংসদ সদস্যদের মধ্যে মাত্র ৪ শতাংশ ছিলেন "ব্যবসায়ী", আর এখনকার সংসদে "ব্যবসায়ীরা" হলেন মোট সংসদ সদস্যদের ৮৮ শতাংশ। অবশ্য সম্মানিত ঐসব সংসদ সদস্যদের "ব্যবসাটা" যে কী তা নির্বাচন কমিশনও জানে না।

[২৬] এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন: আবুল বারকাত, ২০০৫, "Criminalization of Politics in Bangladesh", SASNET Lecture, Lund University, Sweden, 15 March 2005; আবুল বারকাত, ২০০৫, "Right to Development and Human Development: The Case of Bangladesh", Lecture Session organized by Sida and Föreningen for SUS, Sida Auditorium, Stockholm, Sweden, 18 March 2005.

বিকশিত হয়েছে ধর্ম। এ ভ্যাকুয়াম-টাই ব্যবহার করছে মৌলবাদী রাজনীতি। তারা অতীতে চোখের সামনে দেখেছেন কেমন করে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এমনকি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল গণতন্ত্র চর্চার স্থান ভারতেও দুচারটে সংসদ আসন দখল করে ১০/১৫ বছর পরে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিল এবং মানুষ এই ২০১৫ সালেও অনুরূপ দৃশ্য লক্ষ্য করছেন। অন্যান্য অনেক উদাহরণসহ এটাও বাংলাদেশে রাষ্ট্র ক্ষমতার শীর্ষে আরোহনে তাদের স্বপ্নকে বাস্তব করবে বলে তারা মনে করে। আর তারা স্পষ্ট জানে যে দলীয় রাজনীতিকে স্বয়ম্ভর করতে তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক শক্ত ভীত প্রয়োজন। অন্যথায় ক্যাডারভিত্তিক দল গঠন ও পরিচালন এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের মডেল চর্চা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে এখন ক্যাডারভিত্তিক রাজনীতির সহায়তায় মৌলবাদ যে সব আর্থ-রাজনৈতিক মডেলের তুলনামূলক কার্যকারিতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে তার মধ্যে ১২-টি বৃহৎ বর্গ হল নিম্নরূপ: (১) আর্থিক প্রতিষ্ঠান, (২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, (৩) ঔষধ শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, (৪) ধর্ম প্রতিষ্ঠান, (৫) ব্যবসায়িক-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, (৬) যোগাযোগ-পরিবহন ব্যবস্থা সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান, (৭) জমি ও রিয়েল এস্টেট, (৮) সংবাদ মাধ্যম ও তথ্য প্রযুক্তি, (৯) স্থানীয় সরকার, (১০) বেসরকারি সংস্থা, (১১) ইসলামি জঙ্গি সংগঠন (যেমন বাংলাভাই, জেএমবি, হুজি-বি এবং অনুরূপ কর্মসূচিভিত্তিক সংগঠন/সংস্থা/গ্রপ); এবং (১২) কৃষক-শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সমিতির কর্মকাণ্ড কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান (ছক ১ দ্রষ্টব্য)। এসব প্রতিষ্ঠানের সবগুলি মুনাফা অর্জনযোগ্য প্রতিষ্ঠান নয় (যেমন স্থানীয় সরকার ও পেশাজীবী সমিতি) এক্ষেত্রে ক্রস-ভর্তুকি দেয়া হয় এবং সেই সাথে মুনাফা-অযোগ্য প্রতিষ্ঠানেও তারা উচ্চ মুনাফা করেন (যেমন বাংলাভাই জাতীয় প্রকল্প[২৭] যেখানে ভূমি খাজনা, চাঁদাবাজি প্রতিষ্ঠা করা হয়; এমনকি কোনো কোনো অঞ্চলে মাদ্রাসাতেও অত্যুচ্চ মুনাফা অর্থাৎ বছর শেষে ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশি হয়)। মানুষের ধর্মীয় আবেগ অনুভূতি ব্যবহার করে আপাতদৃষ্টিতে মুনাফা অযোগ্য প্রতিষ্ঠানে মুনাফা সৃষ্টির-নিরঙ্কুশ তুলনামূলক সুবিধা (absolute comparative advantage) তাদের আছে (বিষয়টি ধর্ম ও ব্রেইন: স্নায়ুতান্ত্রিক বা মনোজাগতিক ধর্মদর্শন বা "neurotheology" শিরোনামক অষ্টম অনুচ্ছেদে বিশ্লেষণ করা হয়েছে)।

মৌলবাদের অর্থনীতির উল্লিখিত মডেলসমূহের ব্যবস্থাপনা-পরিচালন কৌশল সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের নীতি-কৌশল থেকে অনেক দিক থেকে ভিন্ন। তাদের অর্থনৈতিক মডেল পরিচালন কৌশলের অন্যতম কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

১. প্রতিটি মডেলই রাজনৈতিকভাবে উদ্বুদ্ধ উচ্চমানসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক রাজনৈতিক লক্ষ্যার্জনে নিয়োজিত।

---

[২৭] এইসব কর্মকাণ্ডভিত্তিক ইসলামি মৌলবাদী সংগঠনগুলো আপাতদৃষ্টিতে মূলধারার ইসলামপন্থি দলের থেকে আলাদা—জঙ্গিরূপ। এটা আসলে প্রকৃত সত্যের বাহ্যিক রূপ (appearance), প্রকৃত সত্য হলো ঠিক উল্টোটা– মৌলবাদী জঙ্গিরা মূলধারার ইসলামপন্থি রাজনৈতিক দলেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাদেশে এই রকম জঙ্গী- মৌলবাদী গ্রুপের সংখ্যা ১৩২টি। এসব ধর্মভিত্তিক জঙ্গি গ্রুপের তালিকা পরিশিষ্ট ১-এ দেখুন। এসব জঙ্গি সংগঠন বিদেশি উৎস এবং/অথবা দেশের মৌলবাদের অর্থনীতি থেকে তহবিল সংগ্রহ করে থাকে (সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণসহ প্রাথমিক তালিকার জন্য বিস্তারিত দেখুন: আবুল বারকাত, ২০০৭, "Islamic Militants in Bangladesh: An Analysis on the basis of 30 Case Studies", in Berger MS and A Barkat" (2007), Radical Islam and Development AID in Bangladesh, Netherlands Institute for International Relations, "Clingendael"।

ছক ১: মৌলবাদের আর্থ-রাজনৈতিক সাংগঠনিক মডেল

২. প্রতিটি মডেলে বহুস্তরবিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় যেখানে নির্দিষ্ট স্তরের মূল নীতি-নির্ধারণী কর্মকাণ্ড রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনস্থ।

৩. বিভিন্ন মডেলের মধ্যে কো-অর্ডিনেশন থাকলেও উচ্চস্তরের কো-অর্ডিনেটরদের পরস্পর পরিচিতি যথেষ্ট গোপন রাখা হয় (এক ধরনের গেরিলা যুদ্ধের রণনীতি বলা চলে)।

৪. প্রতিটি মডেলই সামরিক শৃংখলার আদলে পরিচালিত সুসংবদ্ধ-সুশৃংখল ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠান।

৫. কোনো মডেল যখনই আর্থ-রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে অন্য মডেলের তুলনায় অধিক ফলপ্রদ মনে করা হয় তখনই তা যথাসাধ্য দ্রুত অন্যস্থানে বাস্তবায়িত (replicate) করা হয়।

সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে মৌলবাদীরা তাদের অর্থনৈতিক মডেল বাস্তবায়নে "রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে" রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ সচেতন এবং তা বাস্তবায়নে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে তারা তাদের মত করে ঢেলে সাজাতে সচেষ্ট। এ থেকে এও প্রতীয়মান হয় যে মৌলবাদীর মূলে আছে ভীতি ও আবেগ। আর এ আবেগ আসে ক্রমবর্ধমান অসমতা থেকে তথাপি এসব আবেগানুভূতি কেবল সেকেলে এবং পিছুটান নয় বরং তারা সৃজনশীল এবং 'আধুনিকতা'র ধারক বাহকও।

অনেকেই মনে করেন এ দেশে সশস্ত্র জঙ্গি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনে সব অর্থ বিদেশ থেকেই পেয়ে থাকে। এ ধারণা বহুলাংশে মিথ্যে হতে পারে যদিও সম-মতাদর্শী বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সাথে তাদের যৌথ উদ্যোগের ব্যবসা-বাণিজ্য আছে। আর সেই সাথে তাদের নিয়ন্ত্রিত বেসরকারি সংস্থাসমূহের অনুদানের বড় অংশ বিদেশ থেকেই আসে (প্রদর্শ ১ দেখুন)।

বক্স ১: মূলধারার 'ইসলামী' দল এবং ধর্মীয় উগ্রবাদীদের মধ্যে সম্পর্ক: অর্থের উৎস

২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট দেশব্যাপী ব্যাপকভাবে আলোচিত 'জামায়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ' (জেএমবি) নামে একটি ধর্মীয় উগ্রবাদী সংগঠন ৬৩টি জেলা প্রশাসন কার্যালয় এবং আদালত প্রাঙ্গণে মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যে একসঙ্গে ৫০০ বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এ ঘটনার পর একশ্রেণীর সুচতুর ব্যক্তি হঠাৎ করেই মূলধারার 'ইসলামী' দলের সাথে ধর্মীয় জঙ্গীবাদীদের সম্পর্ক অস্বীকার করার অপচেষ্টা চালায়। হঠাৎ সম্পর্কহীন করার তাদের এই অপচেষ্টা এবং 'পৃথক' করে ভাববার অপপ্রয়াস কোনোভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অধিকন্ত মূল 'ইসলামী' দলের সাথে উগ্রবাদীদের সম্পর্ক আরও যথেষ্ট মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা হওয়ার কারণ হল: শুধু সশস্ত্র জিহাদীরাই নয়, মূল ধারার 'ইসলামী' দলও তাদের প্রধান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে 'রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল', দলীয় প্রধান প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে যে, 'ইসলামি আইন খুব শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হবে' এবং অপেক্ষা করুন এবং দেখুন'..... নির্দেশনা পাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন।' এদেশের প্রধান ইসলামি দল প্রকাশ্যে এখনও নাম উল্লেখ করে বোমা বিস্ফোরণ কর্মকাণ্ড এবং বোমা নিক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে কোনো নিন্দা জ্ঞাপন বা বাতিল (জেএমবি) করার কথা বলেনি। যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, জেএমবি'র গ্রেফতার হওয়া সকল নেতা-কর্মীরা জামায়াত-এ ইসলামী অথবা তাদের ছাত্র সংগঠনের সদস্য ছিল। বোমা হামলা কার্যক্রমকে সফল করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন হতো তাদের ব্যাংকের মাধ্যমে এবং জঙ্গিদের প্রায় সব মামলাতেই তাদের প্রশাসনিক প্রভাব সরকারি প্রশাসনযন্ত্র ব্যবহার করে গ্রেফতারকৃত জঙ্গিদের মুক্ত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে। অধিকাংশ মামলার ক্ষেত্রেই তাদের উদ্দেশ্যকে সার্থক করেছে। কিন্তু যেখানেই তারা ব্যর্থ হয়েছে, তারা তাড়াতাড়ি করে গ্রেফতার হওয়া সংশ্লিষ্ট জঙ্গীকে দল থেকে বহিষ্কার করেছে। এসব বিষয়ে বিভিন্ন খবর খুব দ্রুত বাংলাদেশের সকল প্রধান দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশ পেয়েছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরগুলো হচ্ছে: প্রথম আলো ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৫, শিরোনাম– 'চট্টগ্রামে জামায়াত-এ-ইসলামী'র সাথে জড়িত পাঁচ জেএমবি নেতা গ্রেফতার; ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ইসলামি ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন; দি ডেইলি স্টার ৩১ আগস্ট ২০০৫– 'এক বছরে দাতাদের কাছে থেকে ৩৪টি ইসলামি এনজিও দুইশত কোটি টাকার বেশি সাহায্য পেয়েছে; ডেইলি স্টার ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৫ 'জামায়াত জঙ্গি সম্পর্ক এখন স্পষ্ট'; ইত্তেফাক ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৫ 'এক হাজারের অধিক জঙ্গির মুক্তি, এদের মধ্যে ৪০ শতাংশ জামায়াত ইসলামী দলের; ডেইলি স্টার ৫ ডিসেম্বর ২০০৫ ' ২৯ নভেম্বরের দু'টি আদালত প্রাঙ্গনে হত্যাকাণ্ড ঘটার মাত্র ক'দিন আগেই সরকার কুয়েতি এনজিও রিভাইভাল ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি (আর আই এইচ এস) নামের একটি শীর্ষস্থানীয় দাতা সংস্থা জঙ্গিদের জন্য দেয়া প্রায় ২ কোটি টাকার সাহায্য ছাড় দেয়ার জন্য সম্মতি দেয়।

উল্লিখিত ধারণা বহুলাংশে সত্য নয় এজন্য যে মৌলবাদ ইতোমধ্যে তার নিজস্ব অর্থনৈতিক শক্ত ভিত তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে[২৮]।

আর এসব ঘটনা যে প্রক্রিয়ায় যেভাবে ঘটেছে এবং ঘটছে তা হল এরকম— উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বাহক শক্তিটি ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে জনগণের সম্পদ হরিলুট করেছে এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনে ১৯৭০-৮০-র দশকে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক অর্থ সরবরাহ পেয়েছে; এসব অর্থ সম্পদ তারা সংশ্লিষ্ট আর্থ-রাজনৈতিক মডেল গঠনে বিনিয়োগ করেছে; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের বিনিয়োজিত প্রতিষ্ঠান উচ্চ মুনাফা করছে; আর এ মুনাফার একাংশ তারা

[২৮] মৌলবাদ বিশ্বায়নের সৃষ্টি এক নবজাত অথচ বেপরোয়া সন্তানের মতো যার বিরূপ প্রতিফল এবং সময়মত সীমাহীন খারাপ ব্যবহার বিশ্বায়ন ভোগ করছে। মৌলবাদী দল বিশ্বের সব জায়গায় অত্যাধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির সদব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। আয়াতুল্লাহ খোমেনি ইরানে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসার আগে তার উপদেশ নির্দেশনার বিষয়গুলো ভিডিও এবং ক্যাসেটের মাধ্যমে প্রচার করে। হিন্দু জঙ্গিরাও মানুষের মধ্যে হিন্দু ধর্মের স্বরূপের অনুভূতি সৃষ্টির জন্য ব্যাপকভাবে ই-মেইল এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করেছে (এন্থনি গিডেনস্, ২০০৩, Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives, 50-51)। মিসরের আরব বসন্ত আন্দোলনে ইসলামিক ব্রাদারহুডের সদস্যরা ব্যাপকহারে এসএমএস, ফেইসবুক, ই-মেইল, টুইটারসহ তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে। করছে। বাংলাদেশে গণজাগরণ মঞ্চের প্রতিপক্ষ মৌলবাদী শক্তি ব্লগসহ তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারে যথেষ্ট পারদর্শিকতা প্রদর্শন করেছে। করছে।

ব্যয় করছে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে[২৯], একাংশ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রসারে, আর (কখনও কখনও) একাংশ নূতন খাত-প্রতিষ্ঠান সৃষ্টিতে।

আমার ২০১৪ সনের হিসেবে বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতির বার্ষিক নিট মুনাফা আনুমানিক ২,৪৬৪ কোটি টাকা (৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। এ মুনাফার সর্বোচ্চ ২৭ শতাংশ আসে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে (ব্যাংক, বিমা, লিজিং কোম্পানি ইত্যাদি); দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৮.৮ শতাংশ আসে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা থেকে[৩০]; বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে আসে ১০.৮ শতাংশ; ঔষধ শিল্প ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারসহ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান থেকে আসে ১০.৪ শতাংশ; শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আসে ৯.২ শতাংশ; রিয়েল এস্টেট ব্যবসা থেকে আসে ৮.৫ শতাংশ, সংবাদ মাধ্যম ও তথ্য প্রযুক্তি থেকে আসে ৭.৮ শতাংশ, আর পরিবহন-যোগাযোগ ব্যবসা থেকে আসে ৭.৫ শতাংশ (সারণি ৩ দেখুন)। নিট মুনাফার এ প্যাটার্ন কিছুটা অনুমান নির্ভর হলেও যথেষ্ট দিক নির্দেশনামূলক– অর্থাৎ খাত-প্রতিষ্ঠানওয়ারি মৌলবাদের অর্থনীতির বিকাশ ধারা নির্দেশে যথেষ্ট সহায়ক। সেই সাথে মৌলবাদের অর্থনীতির খাত-প্রতিষ্ঠানওয়ারি নিট মুনাফার যে ধারা দেখা যায় তা মূল স্রোতের অর্থনীতির সাথেও যথেষ্ট সাযুজ্যপূর্ণ যেখানে ইতোমধ্যেই রেন্ট সিকিং উদ্ভূত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন নিয়ামক ভূমিকায় অবতীর্ণ।

বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতি যদি বছরে ২,৪৬৪ কোটি টাকা নিট মুনাফা সৃষ্টি করে থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে অর্থনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণ মাত্রা (degree of communalization of economy)– যা মৌলবাদের অর্থনীতির শক্তি-মাত্রা নির্দেশ করে– হবে নিম্নরূপ:

১. দেশের মোট বার্ষিক জাতীয় বিনিয়োগের (চলতি মূল্যে) ১.০২ শতাংশের সমপরিমাণ, অথবা

২. দেশের মোট বার্ষিক বেসরকারি বিনিয়োগের ১.৩১ শতাংশের এর সমপরিমাণ, অথবা

৩. সরকারের মোট বার্ষিক রাজস্ব আয়ের ২.১ শতাংশের সমপরিমাণ, অথবা

৪. দেশের বার্ষিক রপ্তানি আয়ের ১.৫৪ শতাংশের সমপরিমাণ, অথবা

---

[২৯] রাজনৈতিক কর্মীদের বেতন ভাতা; দৈনন্দিন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনে ব্যয়; "হেফাজতে ইসলাম" জাতীয় কর্মকাণ্ডে ব্যয়; অস্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা (ভারতের বিদেশ মন্ত্রণালয় অভিযোগ তুলেছে যে বাংলাদেশে মৌলবাদীদের ১৪৮-টি অস্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে— এ অভিযোগ আনুষ্ঠানিকভাবে খণ্ডন করা হয়নি। অনুরূপ অভিযোগ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নও।)

[৩০] এদেশে মৌলবাদীদের নিয়ন্ত্রণে আছে আনুমানিক ২৩১টি বেসরকারি সংস্থা। এদের মধ্যে মধ্যে ১০টি সবচেয়ে প্রভাবশালী ইসলামী এনজিও উগ্রবাদী কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত– যেমন, 'রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি (আর আই এইচ এস), রাবিতা আল-আলম আল-ইসলামী, সোসাইটি অব সোস্যাল রিফর্মস, কাতার চ্যারিটেবল সোসাইটি, আল-মুনতাদা আল-ইসলামী, ইসলামিক রিলিফ একেন্সি, আল– ফরকাল ফাউণ্ডেশন, ইন্টারন্যাশনাল রিলিফ অর্গানাইজেশন, কুয়েত জয়েন্ট রিলিফ কমিটি, মুসলিম এইড বাংলাদেশ। বৈদেশিক অর্থ সাহায্যের অধিকাংশই এসব সংগঠন পায় মধ্যপ্রাচ্য থেকে। এদের অনেকেই এমনকি উন্নত পুঁজিবাদী দেশের দাতা সংস্থার অর্থ পেয়ে থাকে। এমনও দেখা গেছে যে অনেক ক্ষেত্রেই তারা তা সরাসরি পেয়ে থাকেন, যার হিসেব পত্তর সরকারি নথি পত্রে অনুপস্থিত। মৌলবাদীদের নিয়ন্ত্রণাধীন বেসরকারি সংস্থার প্রাথমিক লক্ষ্য জনগণের কাছে পৌছানোর জন্য সংস্থার প্লাটফর্মকে ব্যবহার করা এবং পরবর্তীতে তাদের রাজনৈতিক এজেন্ডার সাথে অর্থনৈতিক স্বার্থের সম্মিলন ঘটানো। এদেশে মূল ধারায় বেসরকারি সংস্থারা যখন নারীর ক্ষমতায়ন সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ নিচ্ছেন তখন মৌলবাদী বেসরকারি সংস্কৃতি পিছিয়ে নেই, তবে তারা বলছেন "নারীর ক্ষমতায়ন হতে হবে পর্দার অন্তরালে"।

সারণি ৩: বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতির খাত-প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বার্ষিক নিট মুনাফা, ২০১৪ সাল*

অর্থনৈতিক খাত-প্রতিষ্ঠান	বার্ষিক নিট মুনাফা (কোটি টাকায়)	মোট নিট মুনাফার শতাংশ
০১. আর্থিক প্রতিষ্ঠান: ব্যাংক, বিমা, লিজিং কোং	৬৬৫	২৭.০
০২. বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান: খুচরা, পাইকারি, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর	২৬৬	১০.৮
০৩. ঔষধ শিল্প, ডায়াগনস্টিক সেন্টারসহ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান	২৫৬	১০.৪
০৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়	২২৬	৯.২
০৫. যোগাযোগ-পরিবহন: রিকসা, ভ্যান, তিন চাকার সিনজি, কার, ট্রাক, বাস, লঞ্চ, স্টিমার, সমুদ্রগামী জাহাজ, উড়োজাহাজ	১৮৫	৭.৫
০৬. জমি, দালান (রিয়েল এস্টেট)	২০৯	৮.৫
০৭. সংবাদ মাধ্যম, তথ্য প্রযুক্তি	১৯৩	৭.৮
০৮. বেসরকারি সংস্থা, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন, অন্যান্য	৪৬৪	১৮.৮
মোট	২,৪৬৪	১০০

উৎস: আবুল বারকাত, ২০১৫, Imperialism and Religious Fundamentalism: A Treatise on Political Economy with reference to Bangladesh, পৃ: ৩৫-৩৯।

* পরিমাপ পদ্ধতি প্রসঙ্গে: অর্থনৈতিক খাত-প্রতিষ্ঠানভিত্তিক মুনাফা পরিমাপে "হিউরিস্টিক পদ্ধতি" প্রয়োগ করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে বেশি মাত্রায় অনুমান নির্ভরতা থাকলেও অনুমানের ভিত্তি যথেষ্ট মাত্রায় বিজ্ঞানসম্মত। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাত-ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে হিসেবপত্তর প্রকৃত সত্যের কম বেশি হতে পারে (প্রকৃত সত্য কেউ জানে না; তা প্রকাশিত নয়)। কয়েকটি খাত-প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক তথ্য পাওয়া গেলেও (যা সঠিক নয়) বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সে তথ্য অনুপস্থিত/অপ্রকাশিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকাশিত অডিট রিপোর্ট এবং/অথবা বার্ষিক রিপোর্ট থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা পূর্ণাঙ্গ সত্য/সঠিক নয়। এ হিসেব প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিলো ২০০৫ সালে (দেখুন, আবুল বারকাত, বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতি, ড. আব্দুল গফুর স্মারক বক্তৃতা, ২১ এপ্রিল ২০০৫)।

৫. সরকারের মোট বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের ৫.৫৮ শতাংশের সমপরিমাণ, অথবা

৬. সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের অভ্যন্তরীণ সম্পদের ৮.৬২ শতাংশের সমপরিমাণ, অথবা

৭. বিগত চল্লিশ বছরে (১৯৭৫-২০১৪) মৌলবাদের অর্থনীতি সৃষ্ট ক্রমপুঞ্জীভূত নিট মুনাফার মোট পরিমাণ হবে বর্তমান বাজারমূল্যে কমপক্ষে ২ লক্ষ কোটি টাকা (যা সরকারের বর্তমান অর্থবছরের বাজেটের সমপরিমাণ)।

সেই সাথে বিকাশ-বিস্তৃতির সম্ভাবনা নির্দেশে আরো গুরুত্বপূর্ণ হল এই যে যেহেতু মৌলবাদের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার (বার্ষিক গড়ে ৮ শতাংশ থেকে ১০.৫ শতাংশ) মূল স্রোতের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার (বার্ষিক গড়ে ৬ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশ)-এর তুলনায় অধিক সেহেতু অর্থনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণ– অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে– এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণের খুব একটা অবকাশ নেই।

মৌলবাদের অর্থনীতির গঠন প্রক্রিয়া, বিস্তৃতি ও সম্ভাবনা-প্রবণতা বিশ্লেষণে কয়েকটি গুরুত্ববহ বিষয় নির্দ্বিধায় বলা সম্ভব, যা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে এবং মৌলবাদী জঙ্গিত্ব দমনের উপাদান হিসেবে দেখা উচিত। বিশ্লেষিত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিম্নরূপ:

প্রথমত: তারা স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে সম্ভাব্য উচ্চ মুনাফা অর্জনের খাতসমূহে বিনিয়োগ করছে, অর্থাৎ পারলৌকিক জীবন নিয়ে লৌকিকতায় তারা যতই পারদর্শিতা প্রদর্শন করুন না কেন ইহলৌকিক-পার্থিব জীবন সম্পর্কে তারা অনেকের চেয়ে অধিকতর সজাগ-সচেতন।

দ্বিতীয়ত: তারা স্ট্রাটেজিক বিনিয়োগে অধিক উৎসাহী।

তৃতীয়ত: বিনিয়োগের খাত নির্ধারণে তারা দ্রুত জনগণের সাথে সম্পৃক্ত হবার ক্ষেত্রগুলিকেই বেছে নিয়েছে।

চতুর্থত: তাদের খাত-প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বিনিয়োগ কাঠামো যথেষ্ট ভারসাম্যপূর্ণ।

পঞ্চমত: তাদের বার্ষিক নিট মুনাফার মাত্র ১০ শতাংশ সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করে কমপক্ষে ৫০০,০০০ দলীয় সদস্য পূর্ণকালীন নিযুক্তি দেয়া সম্ভব। তারা সেটা করেন এবং অন্যান্য খাতে ক্রস-ভর্তুকি দেন।

ষষ্ঠত: সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের স্ট্রাটেজিক অবস্থানে উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ক্যাডারদের পরিকল্পিতভাবে অন্তর্ভুক্তির জন্য তারা তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা (অপ) ব্যবহার করেন।

সপ্তমত: সশস্ত্র জঙ্গিরা এতই সংগঠিত ও শক্তিমান যে জঙ্গিরা ধরা পড়লে তাদের আনুষ্ঠানিক ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল এবং ক্ষমতার ভিতরে কোনো কোনো শক্তি তাদের ছেড়ে দেবার জন্য প্রশাসনিক ও রাষ্ট্রক্ষমতা অপপ্রয়োগ করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অদৃশ্য শক্তি প্রয়োগ করে লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়; চিহ্নিত জঙ্গিদের ধরে ছেড়ে দিতে হয়; আর তাদের নিয়ন্ত্রক গড-ফাদাররা সম্পূর্ণ ধরা ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়।

অষ্টমত: রেন্ট সিকিং সিস্টেমে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন উদ্ভূত ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা যেমন মানুষের মধ্যে ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িক আবেগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, তেমনি এ আবেগানুভূতি ব্যবহার করে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি যে মৌলবাদের অর্থনীতি সৃষ্টি করেছে তারও ভিত্তি ঐ রেন্ট সিকিং যা দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বাড়াচ্ছে। বাংলাদেশে মূলধারার অর্থনীতির মধ্যে যে মৌলবাদের অর্থনীতি গড়ে উঠেছে তারও ভিত্তি যে রেন্ট সিকিং তার অনেক স্পষ্ট প্রমাণ আছে।

নবমত: মৌলবাদের অর্থনীতির মূল খাত-ক্ষেত্রগুলিই এমন যেখানে তুলনামূলক সহজেই রেন্ট সিকিং কর্মকাণ্ড পরিচালন সম্ভব। এসব খাত-ক্ষেত্রের অন্যতম হলো আর্থিক খাতের ব্যাংকিং, বিমা, লিজিং কোম্পানি, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ঔষধ শিল্প ও ডায়াগনোস্টিক সেন্টারসহ স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ-পরিবহন, জমি-দালান-রিয়েল এস্টেট, অতি মুনাফাকারী প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সংবাদ মাধ্যম, তথ্য-প্রযুক্তি এবং বিভিন্ন ধরনের ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশন।

দশমত: ধর্মের নামে হিসেব-পত্তর পদ্ধতি শরিয়াহ ভিত্তিক করার ক্ষেত্রে নানান ফাঁকি-জুকি যা রেন্ট সিকিং এর নামান্তর মাত্রই শুধু নয় তা রেন্ট সিকিং সর্বোচ্চকরণে সহায়ক।

একাদশত: তথাকথিত শরিয়াহ্-র নামে তারা তাদের আর্থিক-সামাজিক কর্মকাণ্ডের পক্ষে রাজনীতি ও সরকারকে ব্যবহার করে এমনসব বিধি-বিধান-নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রেন্ট সিকিং এর মধ্যেই পড়ে।

দ্বাদশত: মূল অর্থনীতির মধ্যে মৌলবাদের অর্থনীতি সৃষ্টির ফলে ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িক এ গোষ্ঠী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে এমনভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম যখন দেশে হরতাল-অবরোধসহ অনুরূপ বিষয়াদি অর্থায়ন করে তারা বাজার অর্থনীতির কালোবাজারি-মজুদদারি উস্কে দিয়ে বাজার সন্ত্রাসী ও মূল্য-সন্ত্রাসী রেন্ট-সিকার-দের সহায়তা করে। অনেক ক্ষেত্রে এমনটিও হওয়া সম্ভব যে মৌলবাদের অর্থনীতি নিজেই সরাসরি রেন্ট-সিকার এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

ত্রয়োদশত: এ প্রক্রিয়ায় আমাদের দেশে ইসলাম ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ শুধুমাত্র মূলধারার অর্থনীতির মধ্যে মৌলবাদের অর্থনীতিই সৃষ্টি ও বিকশিত করেনি, তারা সৃষ্টি করেছে "সরকারের মধ্যে সরকার" এবং "রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র" (রাষ্ট্রের হেন যন্ত্রাংশ নেই যেখানে তাদের উপস্থিতি সরব-সবল নয়)।

৭. মৌলবাদের অর্থনীতি, রাজনীতি ও জঙ্গিত্ব: যোগসূত্র কোথায়?

ধর্মীয় মৌলবাদ এদেশে ইতোমধ্যে "অর্থনৈতিক ক্ষমতাভিত্তিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এ শক্তি দেশজ ও বহিঃস্থ বিভিন্ন শক্তির সহায়তায় ধর্মের নামে 'জিহাদ' এর মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতাটাই দখল করতে চায়। এ অবস্থায় মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির সুদূরপ্রসারি লক্ষ্যের বাস্তব বহিঃপ্রকাশ অনুধাবনের অন্যতম মানদণ্ড হিসেবে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক ও রাজনীতি-সম কর্মকাণ্ডে মৌলবাদী জঙ্গিদের সম্পৃক্ততা, ব্যাপকতা ও সম্ভাব্য প্রবণতাসমূহের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বিগত প্রায় পঁচিশ বছরে, ১৯৯২-২০১৫ সময়কালে বাংলাদেশে মৌলবাদী জঙ্গিরা বহু মানুষ হত্যা করেছে, অনেককে গুরুতর আহত করেছে, অনেক প্রতিষ্ঠান নির্মূল করেছে (দেখুন সারণি ৪ ও ৫)।

ধর্মীয় উগ্রবাদী কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণে দেখা যায় ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনশীল এক চিত্র। পরিবর্তনশীল এ চিত্রে স্পষ্ট হয়: তুলনামূলক স্বল্পমাত্রার জঙ্গিত্ব থেকে অধিক মাত্রার জঙ্গিত্বে উত্তরণ। যার মধ্যে আছে 'লুক্কায়িত থেকে প্রকাশ্য পদ্ধতি; 'এক মুখী হাতিয়ারের পরিবর্তে বিধ্বংসী বোমা ব্যবহার'; চার স্তরবিশিষ্ট "জিহাদের" (উল্লেখ্য পবিত্র কোরআন শরিফে কোথাও জিহাদের কথা নেই যা আছে তা হলো আত্মরক্ষামূলক "পবিত্র যুদ্ধ") প্রথম স্তরের 'জিহাদ' থেকে চতুর্থ স্তরের জিহাদ অর্থাৎ "কিলাল"– বড় মাপের সম্মুখ যুদ্ধ; স্থানীয় পর্যায়ের জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত করা; একক সাংগঠনিক প্রচেষ্টা থেকে সব জঙ্গিদের নিয়ে একক প্লাটফর্ম গঠনের প্রয়াস ইত্যাদি। এসবের বিশ্লেষণে ধর্মীয় মৌলবাদ ও জঙ্গিত্বের মূল লক্ষ্যের কৌশলিক গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উপ-লক্ষ্য স্পষ্ট হয় যা নিম্নরূপ:

১. রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব দখলের লক্ষ্যে সংস্কৃতি ধারায় পরিবর্তন আনা যা তাদের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। এ জন্য তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু ধর্ম-বর্ণ-পেশা-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মুক্ত চিন্তার মানুষ, সরকারি প্রশাসন যন্ত্র, বিচার বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ (যেমন: জেলা প্রশাসন ও আদালত); ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন সমাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যেমন থিয়েটার, প্রেক্ষাগৃহ, জনসমাবেশ,

সারণি ৪: বাংলাদেশে ধর্মীয় জঙ্গিদের দ্বারা সংগঠিত বড় ধরনের সন্ত্রাসী হামলার ঘটনাক্রম: ১৯৯৯-২০১৫

ঘটনার তারিখ	লক্ষ্যবস্তু মাত্রা/ প্রকৃতি এবং স্থান	প্রত্যক্ষ ক্ষতি
৭ মার্চ ১৯৯৯	উদীচীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণ, যশোর	নিহত ৬, আহত ৭৫
৮ অক্টোবর ১৯৯৯	আহমেদিয়া মসজিদে বোমা বিস্ফোরণ, খুলনা	নিহত ৭, আহত ৪০
২০ জানুয়ারি ২০০১	সিপিবি'র সভায় টাইম বোমা বিস্ফোরণ, ঢাকা	নিহত ৭, আহত ৫২
১৪ এপ্রিল ২০০১	পহেলা বৈশাখ উদযাপন অনুষ্ঠানে রমনার বটমূলে বোমা হামলা, ঢাকা	নিহত ১১, আহত ১২০
৩ জুন ২০০১	রোমান ক্যাথলিক গির্জায় টাইম বোমা বিস্ফোরণ, গোপালগঞ্জ	নিহত ১০, আহত ২৫
১৫ জুন ২০০১	আওয়ামী লীগ অফিসে বোমা বিস্ফোরণ, নারায়ণগঞ্জ	নিহত ২২, আহত ১০০
২৪ সেপ্টেম্বর ২০০১	মোল্লাহাট, বাগেরহাটে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী মিছিলে বোমা হামলা	নিহত ৮, আহত ১০৫
২৫ সেপ্টেম্বর ২০০১	সুনামগঞ্জে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী জনসভার পাশে বোমা হামলা	নিহত ৪, আহত ১৭
১৬ নভেম্বর ২০০১	হিন্দু শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরিকে হত্যা	নিহত
২১ এপ্রিল ২০০২	বৌদ্ধ ভিক্ষু মাহাথেরো হত্যা	নিহত
২৮ সেপ্টেম্বর ২০০২	সাতক্ষীরায় সিনেমা হল ও সার্কাস প্রদর্শণীতে বোমা হামলা	নিহত ৩, আহত ১৭
৭ ডিসেম্বর ২০০২	৪টি সিনেমা হলে বোমা বিস্ফোরণ, ময়মনসিংহ	নিহত ২৭, আহত ২৯৮
১৭ জানুয়ারি ২০০৩	সুফি সামধিতে বোমা বিস্ফোরণ, শখিপুর, টাঙ্গাইল	নিহত ৯ আহত ২৬
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৩	দিনাজপুর মেসে বোমা বিস্ফোরণ	নিহত ০৩
১২ জানুয়ারি ২০০৪	হযরত শাহজালাল মাজারে বোমা বিস্ফোরণ, সিলেট	নিহত ৫, আহত ৫২
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪	অধ্যাপক হুমায়ূন আজাদের উপর আকস্মিক আক্রমণ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)	গুরুতর আহত এবং পরবর্তীতে মৃত্যু
২ এপ্রিল ২০০৪	১০ ট্রাক অস্ত্রবাহী জাহাজ, চট্টগ্রাম বন্দর, ২০০০ অটোমেটিক/সেমি অটোমেটিক রাইফেল, ৪০টি রকেট চালিত গ্রেনেড, ২৫,০০০ হ্যান্ড গ্রেনেড, ১৮ লক্ষ রাউন্ড ছোট বড় গুলি ও বারুদ।	
২১ মে ২০০৪	হযরত শাহজালালের মাজারে বোমা বিস্ফোরণ, সিলেট	নিহত ৮, ব্রিটিশ হাইকমিশনারসহ আহত ১০১
২১ আগস্ট ২০০৪	আওয়ামী লীগের (শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে) জনসভায় গ্রেনেড হামলা	নিহত ২৪, আহত ৫০৩
২৭ জানুয়ারি ২০০৫	বিরোধীদলের (আওয়ামীলীগ) জনসভায় গ্রেনেড হামলা	সাবেক অর্থমন্ত্রী এসএএমএস কিবরিয়াসহ নিহত ৫, আহত ১৫০
০৯ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫	গাইবান্ধ, ঠাকুরগাঁও, জয়পুরহাট, নওগাঁ, রংপুর, সিরাজগঞ্জে ব্রাক ব্যাংক এবং গ্রামীণ ব্যাংকে ডাকাতি	
১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫	এনজিও (ব্র্যাক) অফিসে বোমা হামলা, রায়পুর, নওগাঁ	-
২০০৩-২০০৫	বাংলাভাই দল কর্তৃক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত (জেএমবি), উত্তর বাংলা	নিহত ৩৫, আহত ১২৩
১৭ আগস্ট ২০০৫	৬৩ জেলায় একই সাথে সিরিজ বোমা হামলা (মুন্সিগঞ্জ ছাড়া সব জেলা)	নিহত ৩, আহত কমপক্ষে ১০০
৩ অক্টোবর ২০০৫	৩টা আদালত ভবনে বোমা হামলা (চাঁদপুর, লক্ষীপুর, চট্টগ্রাম)	নিহত ২, আহত ৩৯
১৮ অক্টোবর ২০০৫	দ্রুত বিচার আইন টাইব্যুনাল সিলেটে বোমা বিস্ফোরণ	আহত ১
১৪ নভেম্বর ২০০৫	বিচারকের উপর বোমা হামলা, ঝালকাঠি	নিহত ৩, আহত ৪
২৯ নভেম্বর ২০০৫	চট্টগ্রামের কোর্ট এরিয়ায় বোমা হামলা	নিহত ৯, আহত ৭৮
১ ডিসেম্বর ২০০৫	জেলা প্রশাসক অফিসে বোমা হামলা, গাজীপুর	নিহত ১, আহত ৫০
৮ ডিসেম্বর ২০০৫	উদীচী অফিসে বোমা বিস্ফোরণ, নেত্রকোণা	নিহত ৯, আহত ৫০
২৯ ডিসেম্বর ২০০৫	আইনজীবীভবনে বোমা হামলা, গাজীপুর	নিহত ১০, আহত ২২০

২৯ ডিসেম্বর ২০০৫	পুলিশ বক্সে বোমা হামলা, চট্টগ্রাম	নিহত ৩, আহত ২৫
১৩ মার্চ ২০০৬	কুমিল্লা কালিয়াঝুরিতে বোমা বিস্ফোরণ	নিহত ৪, আহত ১০
২১ জুন ২০০৮	সুনামগঞ্জে আওয়ামী লীগের র‍্যালিতে বোমা হামলা	নিহত ১, আহত ৫১
২১ ডিসেম্বর ২০১৩	পীর লুৎফর রহমানসহ ০৬ জন হত্যাকান্ড	নিহত ৬
২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	ময়মনসিংহের ত্রিশালে ১০-১৫ জন সশস্ত্র মুখোশধারী জেএমবি সদস্য কর্তৃক প্রিজন ভ্যান হতে জেএমবি সদস্য ছিনতাই	নিহত ১, আহত ২
২৭ আগষ্ট ২০১৪	নুরুল ইসলাম ফারুকী	নিহত ১
২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫	ইতালির নাগরিক সিজার তাবেলা হত্যা, ঢাকা	নিহত ১
৩ অক্টোবর ২০১৫	জাপানি নাগরিক কুনিও হোশি হত্যা, রংপুর	নিহত ১
১৫ অক্টোবর ২০১৫	খিজির হায়াত খান	নিহত ১
২৩ অক্টোবর ২০১৫	ঢাকার হোসেনি দালানে গ্রেনেড হামলা	নিহত ২
২৯ অক্টোবর ২০১৫	লুক সরকার	আহত ১
২৬ নভেম্বর ২০১৫	বগুড়ায় শিয়া মসজিদে গুলি বর্ষণ	নিহত ১

উৎস: বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট উৎস থেকে লেখক কর্তৃক সংকলিত। উল্লেখ্য যে সারণিতে বর্ণিত সন্ত্রাসী হামলার অধিকাংশের দায় স্বীকার করেছে জেএমবি অথবা হুজি-বি অথবা আনসারুল্লাহ বাংলা টিম। অবশ্য কোনো কোনো ঘটনার দায় স্বীকার করেছে স্বল্প পরিচিত মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠনের অন্যান্যেরা।

সারণি ৫: আনসারুল্লাহ্ বাংলাটিম/আনসার-আল-ইসলাম কর্তৃক বিভিন্ন ব্লগার ও প্রকাশক হত্যাকাণ্ড, ২০১৩-২০১৫

ক্রমিক	তারিখ	নাম	আহত/নিহত	স্থান
১	১৪ জানুয়ারি ২০১৩	আসিফ মহিউদ্দিন	আহত	ঢাকা
২	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩	রাজীব হায়দার	নিহত	ঢাকা
৩	০২ মার্চ ২০১৩	জগত জ্যোতি তালুকদার	নিহত	সিলেট
৪	০২ জুলাই ২০১৩	আরিফ রায়হান দীপ	নিহত	ঢাকা
৫	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৪	আশরাফুল ইসলাম	নিহত	সাভার
৬	১৫ নভেম্বর ২০১৪	সফিউল ইসলাম লিলন	নিহত	রাজশাহী
৭	২৬ জুন ২০১৪	রাকিব মামুন	আহত	ঢাকা
৮	২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫	অভিজিৎ রায়	নিহত	ঢাকা
৯	৩০ মার্চ ২০১৫	ওয়াসিকুর রহমান বাবু	নিহত	ঢাকা
১০	১২ মে ২০১৫	অনন্ত বিজয় দাস	নিহত	সিলেট
১১	০৭ আগষ্ট ২০১৫	নীলয় নীল	নিহত	ঢাকা
১২	৩১ অক্টোবর ২০১৫	ফয়সাল আরেফিন	নিহত	ঢাকা
১৩	৩১ অক্টোবর ২০১৫	আহমেদুর রহমান টুটুলসহ ৩ জন	আহত	ঢাকা

উৎস: বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট উৎস থেকে লেখক কর্তৃক সংকলিত।

কমিউনিটি সেন্টার, লাইব্রেরি; ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট কিন্তু জামাতের রাজনীতি বিরোধী যেমন সুফি-সমাধিস্থল-মাজার কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান।

২. রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সরকার আসীন থাকলে এ ধরনের সন্ত্রাসী প্রবণতা হয় হ্রাস পায় অথবা প্রবণতার রূপ পরিবর্তিত হয়।

৩. ডানপন্থী বা ধর্মনির্ভর দলের সরকার ক্ষমতাসীন হলে এদের সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের বহুমুখী সম্প্রসারণ ঘটে।

৪. ওদের অপতৎপরতা বাধাগ্রস্ত না হলে ধর্মভিত্তিক জঙ্গিত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় আর বাধাগ্রস্ত হলে জঙ্গিত্ব বৃদ্ধির রূপ পাল্টায়। ক্ষমতার ভাগাভাগিতে তাদের ভূমিকা না থাকলেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কোনো সরকার যদি ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে চায়, মৌলবাদ তখন এটাকে তাদের শক্তি সামর্থ শাণিত করার কৌশলিক সময় ও সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে।

বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিবাদী রাজনীতির উদ্ভব, বিস্তৃতি, যোগসূত্র ও সম্ভাবনা প্রসঙ্গে আরও কিছু জরুরি প্রাসঙ্গিক বিষয় উত্থাপন প্রয়োজন। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে স্বাধীনতার বিজয় নিয়ে আমরা যথেষ্ট মাত্রায় আত্মতুষ্ট ছিলাম। সঙ্গত কারণও ছিল। জাতি হিসেবে আমরা এইই প্রথম দেখলাম যে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা— এ চার মূলনীতির ভিত্তিতে দেশগঠন ও রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। মূল স্রোতের ধর্মীয় চেতনা যদি উদারনৈতিক ও মানবতাবাদী হয়ে থাকে এবং তা বংশপরম্পরা মানস-কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র গঠনের ঐ চার মূলনীতিও আমাদের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার সাথে সম্পূর্ণ সাযুজ্যপূর্ণ ছিল। আমাদের আত্মতুষ্টির কারণ এও হতে পারে যে সম্ভবত তৃতীয় বিশ্বে এবং বিশেষত মুসলিম প্রধান দেশসমূহের মধ্যে আমরাই প্রথম, যারা ধর্মনিরপেক্ষতাকে (secularism, ধর্মহীনতা নয়) সংবিধানে (১৯৭২-এর) অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম (অবশ্য বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে পরবর্তীকালে মুক্তিসংগ্রামের চেতনাবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল মোশতাক-সায়েম-জিয়া অসাংবিধানিক-অবৈধ সরকার সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার মূলনীতি বাতিল করে সংবিধানে "ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম" সংযোজন করেছে)। আমাদের সুপ্ত ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার কাগুজে প্রকাশে আমরা সন্তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু ধর্মীয় উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি (যাদের ক্ষমা করে আমরা ইসলাম ধর্মের মূল স্রোতের বাহকে পরিগণিত হতে পারি) পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলো যে রাষ্ট্র যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে তাতে মানুষের জীবনে মৌলিক কোনো পবিবর্তন ঘটবে না; তারা ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণ করতে পেরেছিলো যে এ মানুষই কয়েক বছরের মধ্যে চলমান নেতৃত্বের প্রতি মোহহীন হবে, আর এ সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে তাদের (মুক্তিসংগ্রামে পরাজিতদের) বিজয় নিশ্চিত হবে। সমসাময়িককালে প্রগতির গতি এগুলো ঢিমে তালে আর তারা লক্ষ্যার্জনে জোরকদমে অথচ বেশ গোপনে এগুবার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করলো (যেমন গ্রাম থেকে শহর দখল; কর্মক্ষেত্রে প্রকৃত রাজনৈতিক পরিচিতি গোপন রাখা ইত্যাদি)। যে প্রস্তুতির ফলশ্রুতিই হলো গ্রাম দখল (ডিপ টিউবওয়েলকেন্দ্রিক সমিতি, কৃষক সমিতি, মসজিদ-মাদ্রাসা– মাধ্যম যাই হোক না কেন), ধর্ম প্রতিষ্ঠানে একচ্ছত্র অবস্থান, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দখল, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান দখল, আর বেসরকারি সংস্থার নামে ব্যাপকভাবে গ্রাম ও শহরের স্বল্পবিত্ত-দরিদ্র মানুষের মধ্যে অবস্থান গ্রহণ ও তা সুদৃঢ়করণ। এ কৌশল কার্যকর করতে মৌলবাদের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানমূহ যেমন নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছে তেমনি এ কৌশল অবলম্বনের ফলে ঐসব প্রতিষ্ঠানও শক্তিশালী হয়েছে। এ নিরিখে ধর্মীয় মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক

রাজনীতির নেতৃত্ব যত না ভাববাদী তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি বাস্তববাদী-বস্তুবাদী। গত অর্ধ শতাব্দীর এ প্রক্রিয়ায় এখন তাদের অর্জনটা এমন যে একদিকে প্রতিটি জাতীয় সংসদ আসনে তারা গড়ে ১৫,০০০ ভোট সংগ্রহে সক্ষম আর অন্যদিকে নির্বাচনে কোটি কোটি টাকার কালো টাকা ও প্রয়োজনীয় পেশি শক্তি সরবরাহের ক্ষমতাও তাদের এখন আছে। আবার একই সাথে পাশাপাশি তারা এখন মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যেই অতি উচ্চমাত্রার সেনা-সূক্ষ্মতাসহ সারা দেশে সশস্ত্র কর্মকাণ্ড পরিচালনে এবং কল্পনাতীত হত্যাযজ্ঞ সাধনে সক্ষম। জনগণ বাধা না দিলে তারা তা অবশ্যই করবে, তার পুনরাবৃত্তি হবে এবং এসবের তীব্রতা ও ক্ষতিমাত্রা বাড়তে থাকবে। এ কোনো দুর্বল প্রতিপক্ষ নয়।

মৌলবাদী জঙ্গিত্বের এ প্রতিপক্ষ বিভিন্নভাবে আন্তসম্পর্কিত ও কৌশলিক সুসংগঠিত এবং তা দেশিয় ও আন্তর্জাতিকভাবে। এ প্রতিপক্ষ আসলে ত্রিভুজাকৃতির আন্তসম্পর্কিত তিন বাহুর সমাহার মাত্র: উপরের বাহুতে আছে 'ইসলাম' নামাঙ্কিত মূল ধারার রাজনৈতিক দল— জামায়াতে ইসলাম (প্রকাশ্য সংগঠন যার বহু ধরনের আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক উপসংগঠন-অঙ্গ সংগঠন আছে), আর নীচের এক বাহুতে আছে ১৩২টি চিহ্নিত জঙ্গি সংগঠন আর অন্য বাহুতে আছে মৌলবাদের অর্থনীতিসহ ২৩১টি বেসরকারি সংস্থা, ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশন (ছক ২ দেখুন)। শেষোক্ত এসব ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশনসমূহ মৌলবাদের অর্থনীতি-উদ্ভূত মুনাফা পাচারের কৌশলিক সংস্থা মাত্র, যেসব সংস্থার মাধ্যমে তাদের জঙ্গিবাদী কর্মযজ্ঞসহ প্রস্তুতিমূলক বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। মৌলবাদী অর্থনীতির বিগত চার দশকে পুঞ্জীভূত নিট মুনাফার পরিমাণ হবে বর্তমান মূল্যমানে আনুমানিক প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা, যার ব্যাপকাংশ তারা এখন ব্যয় করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কাজ প্রলম্বিত করতে, বিদেশি লবিস্টদের ভাড়া করার কাজে, জঙ্গিবাদ সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়নে, নতুন ক্যাডার বাহিনী গঠনে এবং সংশ্লিষ্ট সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে।

বাংলাদেশে মূলধারার অর্থনীতিতে রেন্ট-সিকারদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুবৃর্ত্তায়নের সাথে এখন যুক্ত হয়েছে সশস্ত্র মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িক জঙ্গিবাদ। এ জঙ্গিবাদ অতীতে তাদের জঙ্গিত্ব প্রকাশ করেছে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্তভাবে। আর এখন অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে তা অত্যন্ত পরিকল্পিত এবং যথেষ্ট কৌশলিক; ইতোমধ্যে তারা তাদের সশস্ত্র শক্তি প্রদর্শন করে অনেক নিরীহ মানুষ হত্যা করেছে; তাদের বোমায় ইতোমধ্যে বহু নিরীহ মানুষ চিরতরে পঙ্গু হয়েছেন (যা ইতোমধ্যে সারণি ৪ ও ৫-এ দেখানো হয়েছে)। শুধু তাই নয়, এ প্রক্রিয়ায় আত্মঘাতী বোমারু হিসেবে যাদের ব্যবহার করা হয়েছে তাদের প্রায় সকলেই দরিদ্র-নিম্নবিত্ত পরিবারের বেকার মানুষ এবং প্রায় সকলেই আনুষ্ঠানিক মাদ্রাসা শিক্ষালয় থেকে এসেছেন এবং প্রায় সকলেই একটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের অনুসারী। অবশ্য এ কথাও সত্য যে হিযবুত তাহরির সদস্যদের বড় অংশই শহুরে শিক্ষিত সমাজ থেকে আগত।

ধর্মীয় মৌলবাদ ও তৎউদ্ভূত উগ্র জঙ্গিবাদ যে "আত্মঘাতী বোমা সংস্কৃতি" চালু করেছে তার ফলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে দেশের সকল মানুষের জীবন বিপন্ন প্রায়। মুক্তিযুদ্ধে মানবতা বিরোধী অপরাধসহ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া যতই ত্বরান্বিত হচ্ছে এ বিপন্নতা ততই বাড়ছে। তবে বস্তুনিষ্ঠ সত্য ভাষ্যের স্বার্থে এখানে আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে ঐ বিচার প্রক্রিয়া বিচার-সম্ভাব্য মামলার তুলনায় এখনও যথেষ্ট মাত্রায় ধীর গতিসম্পন্ন[৩১]।

[৩১] আবুল বারকাত, ২০১৫, **'বিচারহীনতার সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের উত্থান, স্বরূপ, বিস্তৃতি ও কার্যকারণ সম্পর্ক: সমাধানে সংস্কার নয় প্রয়োজন আমূল পরিবর্তন', বিভাগীয় সেমিনার ২০১৫, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, রংপুর (২৪ অক্টোবর ২০১৫)**।

ছক ২: মৌলবাদী শক্তিসমূহের কৌশলিক আন্তসম্পর্ক

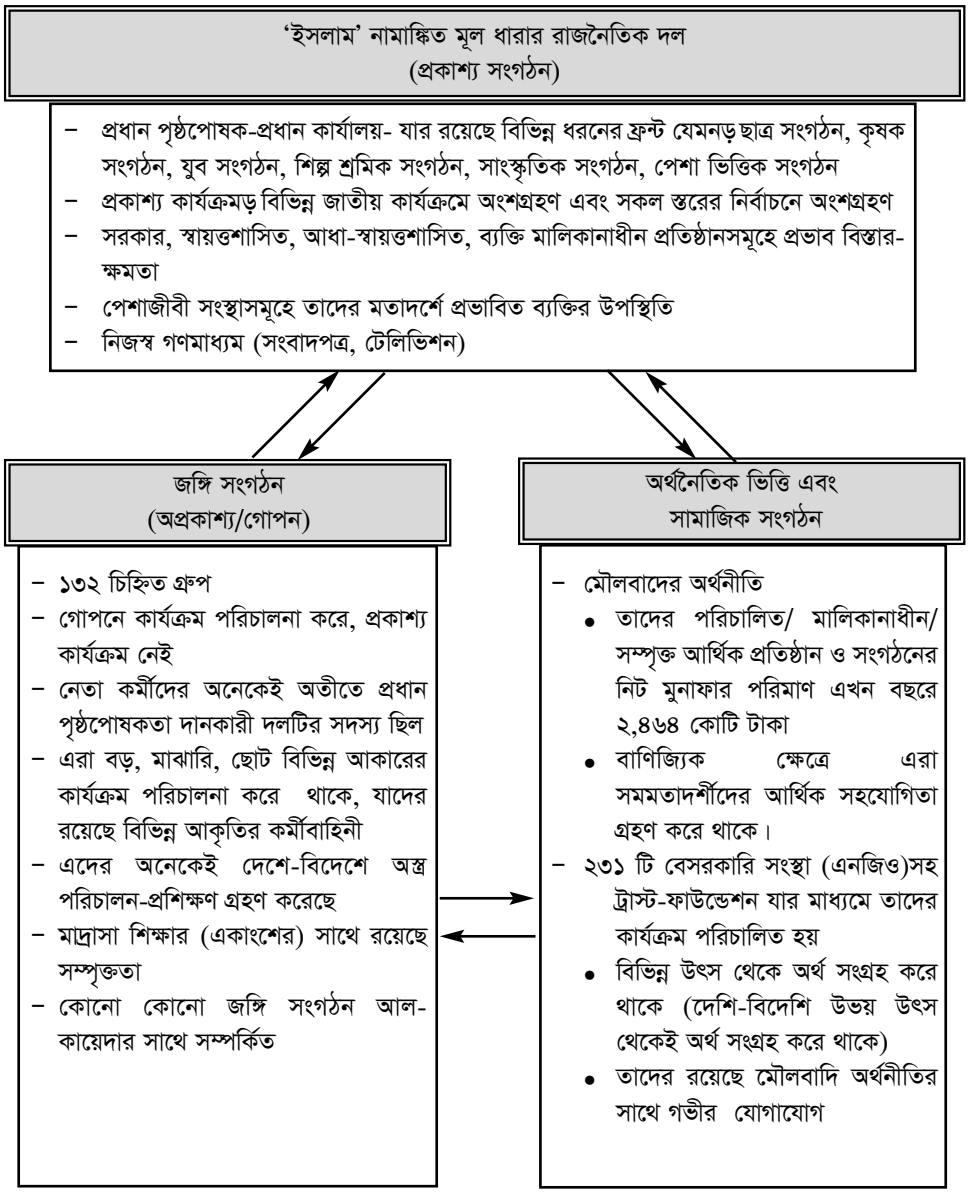

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৌলবাদী জঙ্গিবাদ-উদ্ভুত পরিকল্পিত বিপন্নতার কিছু নূতন মাত্রা লক্ষণীয়। মৌলবাদী জঙ্গিত্বের পরিকল্পিত এসব মাত্রা অস্বীকার করলে অথবা স্বল্প গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে আবারো ভুল হবে। বিপন্নতার নতুন এসব মাত্রা নিম্নরূপ:

১. এ জঙ্গিত্ব দেশের উৎপাদনশীল খাতসমূহের "সরবরাহ চেইন" (supply chain) ভেঙ্গে ফেলে উৎপাদন-বণ্টন-পরিভোগ-এর স্বাভাবিক সিষ্টেমকেই ভেঙ্গে ফেলার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সচেষ্ট।

২. এ জঙ্গিত্ব অর্থনৈতিক কাঠামো বিকল করার লক্ষ্যে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত পণ্যের এবং কাঁচামাল পরিবহনের অবাধ স্বাভাবিক সরবরাহ চেইন অচল করে দিতে চায়। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে দৃশ্যমান যেসব পদ্ধতি তারা ব্যবহার করেছে তার মধ্যে আছ হরতাল, অবরোধ, অগ্নি সংযোগ, সড়ক পথে চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি, ট্রাক-বাস-রেলে অগ্নি সংযোগ, শিল্প প্রতিষ্ঠান ভাংচুর, মিথ্যাচারে মসজিদের মাইক ব্যবহার, ইত্যাদি।

৩. এ জঙ্গিত্ব অর্থনীতির প্রাণ-সংযোগ (life line)— 'অবকাঠামো' গুড়িয়ে দিতে চায়। এ লক্ষ্যে তারা ইতোমধ্যে গান পাউডার ব্যবহার করে দেশের কোনো কোনো এলাকায় পল্লী বিদ্যুৎ উড়িয়ে দিয়েছে। প্রতিহত না করতে পারলে তারা আরও সম্ভাব্য যা করবে তা হলো— বিদ্যুতের জাতীয় গ্রিড অচল করবে, বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিকল করবে, বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে সঞ্চালন বিনষ্ট করবে; (শহরে) পানি সরবরাহ ব্যবস্থা অচল করে দেবে (প্রয়োজনে পানি সরবরাহে কলেরার জীবাণুসহ বিষ প্রয়োগ করবে); রাস্তা-ঘাট-ব্রিজ-কালভার্ট চলাচল অনুপযোগী করার চেষ্টা করবে।

৪. এ জঙ্গিত্ব স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সহ স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান অকার্যকর করার সকল ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে।

৫. এ জঙ্গিত্ব এখন দেশের গ্রামাঞ্চল, ক্ষুদ্র শহর ও শহরতলিতে তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ভয়-ভীতি সৃষ্টির পরিবেশ সৃষ্টি করছে। যার মূল উদ্দেশ্য দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল ইঞ্জিন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের কর্মকাণ্ড বিনষ্টের মাধ্যমে পুরো অর্থনীতিকে নীচে থেকে ভেঙ্গে ফেলা।

৬. এ জঙ্গিত্ব তাদের কমর্কাণ্ড দিয়ে এমন এক ত্রাস সৃষ্টির পরিকল্পনা করেছে যখন গ্রামের হাটবাজার সন্ধ্যার পরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ফলত গ্রামের বাজারে সন্ধ্যার পরে সার, ডিজেল, বীজসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যাবে, যার ফলে আশংকা করা যায় যে গ্রামীণ অর্থনীতিতে মজুতদারি বাড়বে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি রুদ্ধ হবে। এ আশংকা অমুলক নয় যে একদিকে যেমন গ্রামীণ অর্থনীতিতে কালোবাজারি-মজুতদারি বৃদ্ধির ফলে ক্রমান্বয়ে জনজীবন অধিকতর দুর্বিষহ হবে, আর অন্যদিকে এ অবস্থাকেই আবার জঙ্গিরা তাদের জঙ্গিত্ব আরও শানিত করার যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করবে।

৭. এ জঙ্গিত্ব ইতোমধ্যে হেফাজতে ইসলামের নামে আপাতত ঢাকার শাপলা চত্বরে ইসলাম ধর্মের হেফাজতের অজুহাতে সংবিধান বিরোধী ও নারী বিদ্বেষী ১৩ দফা দাবিনামা পেশ করে নাস্তিক-আস্তিক বিভাজনের মাধ্যমে দেশে গৃহযুদ্ধাবস্থা সৃষ্টির প্রয়াস নিয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য আপাতত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধ করা এবং জামাত-ই-ইসলামীর নিষিদ্ধকরণ প্রক্রিয়া বন্ধ করা; আর

আসল উদ্দেশ্য হল ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে রাষ্ট্রক্ষমতাকেই দখল করা।

৮. এ জঙ্গিত্ব আস্তিক-নাস্তিক বিতর্কের সূত্রপাত করে শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চসহ দেশের দেশপ্রেমিক তরুণ প্রজন্মকে জোর করে অন্ধকার যুগে ঠেলে দিতে চায়।

৯. এ জঙ্গিত্ব ইতোমধ্যে নাস্তিকতার অজুহাতে মুক্তবুদ্ধির-মুক্তচিন্তার অনেক মানুষ হত্যা করেছে এবং অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় ভবিষ্যতে আরও করবে।

১০. এ জঙ্গিত্ব ভিন্ন ধর্মের মানুষের উপর পরিকল্পিতভাবে নির্যাতন-নিবর্তন করে তাদের দেশত্যাগে বাধ্য করতে চায়।

১১. এ জঙ্গিত্ব সমগ্র দেশে ভয়-ভীতি প্রদর্শন থেকে শুরু করে যে হারে আত্মঘাতী বোমা ব্যবহার করেছে এবং করবে তাতে বিনিয়োগ অনুৎসাহিত হবে। এ অবস্থা চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত বিনিয়োগহীন এক অর্থনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি হবে যখন ভেঙ্গে পড়বে সমগ্র অর্থনীতি-ব্যবস্থা। আর এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি করতে পারলে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল অসম্ভব নয়। সুতরাং, তারা ধর্মকে ব্যবহার করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের রাজনৈতিক অসৎ উদ্দেশ্য হাসিল করার স্বার্থে অর্থনৈতিক-সামাজিক অবকাঠামো অচল ও ভেঙ্গে ফেলাসহ জনমনে গভীর আতঙ্ক সৃষ্টি করবে– এটাই স্বাভাবিক।

বাংলাদেশে মৌলবাদী জঙ্গিরা ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শত্রু। এ শত্রুদের প্রতিশোধস্পৃহা ধীরে ধীরে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তারা ধর্মের নামে নির্বিচারে মানুষ খুন করেছে ও করবে। উগ্র সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী এ জঙ্গিরা ধর্মের নামে জোরজবরদস্তি করে রাষ্ট্রক্ষমতাটিকেই দখল করতে চায়। সাম্প্রদায়িক জঙ্গিবাদ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিতে চলেছে। ওদের জঙ্গিত্ব ক্রমান্বয়ে অতীতের সকল সীমা অতিক্রম করছে— প্রথমে নিরীহ বেশে ধর্মের বাণী, তারপরে শরীর চর্চার নামে একটু-আধটু প্রশিক্ষণ, তারপরে পটকার খেলা, তারপরে স্পিলিন্টার ছাড়া বোমা, তারপর পিস্তল-রিভলভারের খেলা-প্রদর্শন, তারপর সভাস্থলসহ সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বোমা মেরে মানুষ হত্যার মাধ্যমে বাঙ্গালির সংস্কৃতি হত্যার প্রয়াস, তারপর বাঙ্গালি জাতিকে রাজনীতিবিদ শূন্য করার প্রচেষ্টা, তারপর এক সাথে একই সময়ে দেশের সব জেলা শহরের সরকারি অফিস ও বিচারালয়ে বোমা, তারপর বিচারক হত্যা, পেট্রোল বোমায় গান পাউডার দিয়ে পুড়িয়ে-ঝলসিয়ে শিশু-নারী-বয়োবৃদ্ধ মানুষ নির্বিশেষে হত্যাকাণ্ড নিয়মিতকরণ করা, আর সবশেষে সুইসাইড বোমা। সাম্প্রদায়িক জঙ্গিত্বের ক্রমধারা যা তাতে স্পষ্ট যে ওরা যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছে এবং সুইসাইড বোমাই শেষ কথা নয়। যদি নিরস্ত্র করা না যায় তাহলে সামনে সম্ভবত আরও বড় মাপের নূতন ধরনের বিপর্যয় ঘটবে যা হয়তো বা এ মুহূর্তে কল্পনাও করা যাচ্ছে না। আমাদের ইতিহাসে এ কোনো সাধারণ সংকট নয়— প্রকৃত অর্থেই মহা-বিপর্যয়; গভীর সংকটের এ এক ক্রান্তিকাল।

মৌলবাদের অর্থনীতি ও জঙ্গিবাদ সংশ্লিষ্ট মহা-সংকটটি এমনি যে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত ধর্মান্ধ রাজনীতিকরা অনেক গুরুতর ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথাবার্তা প্রকাশ্যেই বলেছেন। এখনও বলছেন। যেমন তারা বলেন:

১. *"১৯৭১ আর ২০০৫ সাল এক কথা নয়"।*

২. *"আমরা কচুপাতার ওপর বৃষ্টির পানি নই যে টোকা দিলেই পড়ে যাবো"।*

৩. *"কোথায় আজ ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি, আর আমরা আজ কোথায়" (?)*

৪. *"সংসদের কয়েকটি আসন দিয়ে আমাদের শক্তির বিচার করলে ভুল করবেন"।*

৫. *"শীঘ্রই ইসলামি শাসন কায়েম হবে। দেখুন-অপেক্ষা করুন; পরবর্তী নির্দেশের জন্য প্রস্তুত থাকুন"।*

৬. *"ইসলামে আত্মহত্যা পাপ তবে ইসলামি শাসন/হুকুমত কায়েম হয়ে গেলে এসব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে"।*

৭. *"জ্ঞানপাপী মানুষ প্রণীত সংবিধানের পরিবর্তে আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকরী করতে সশস্ত্র জেহাদের মাধ্যমে দেশে যতদিন ইসলামি আইন বাস্তবায়ন না হয় ততদিন তাগুতের বিচারালয়ে যাওয়া বন্ধ রাখুন"।*

৮. *"সশস্ত্র জেহাদ করা আমার অধিকার, আর ঐ জেহাদে অংশগ্রহণ আমার দায়িত্ব। আমার অধিকার প্রতিষ্ঠা ও দায়িত্ব পালনে বাধা দেয়ার ক্ষমতা কারো নেই"।*

৯. *"দেশ গৃহযুদ্ধের দিকে যাচ্ছে, যাবে"।*

১০. *"আমাদের ১৩ দফা (অর্থাৎ হেফাজতে ইসলামের) দাবী না মানা পর্যন্ত তৌহিদি জনতার ঈমানি সংগ্রাম চলতে থাকবে"।*

১১. *(শাহবাগের) "গণজাগরণ মঞ্চের নেতাদের ফাঁসি চাই"।*

১২. *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও যুদ্ধাপরাধীর দায়ে ফাঁসি হওয়া সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ছেলের দম্ভোক্তি – "এ অবিচারের আমরা বিচার করে ছাড়বো"।*

ইসলামি জঙ্গিত্ব-উদ্ভূত মহাসংকটের গভীরতা এখানেও যে ইতোমধ্যে প্রথম ১০ বছরে ধৃত জঙ্গিদের প্রায় সবাই দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান; এদের মধ্যে যারা স্বাক্ষর তাদের প্রায় সবাই মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে এসেছেন; এদের প্রায় সবাই কোনো না কোনোভাবে ধর্ম-ভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন অথবা আছেন। আবার পাশাপাশি ইদানীং ঢাকা শহরসহ বিভিন্ন বিভাগীয় ও জেলা শহরে দেখা যাচ্ছে যে ধর্মভিত্তিক উগ্রজঙ্গিবাদের সাথে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে জড়িত ধনী ঘরের সন্তান এবং ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। আরও দুশ্চিন্তার বিষয় এই যে এখন পর্যন্ত ধৃত ২ হাজার জঙ্গিদের গড় বয়স মাত্র ২২ বছর (১৬ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে)। অথচ ১৫-২০ বছর আগে গণমাধ্যমে জঙ্গি প্রশিক্ষণের যেসব সচিত্র খবর প্রকাশিত হয়েছিল অথবা ১০-২০ বছর আগে যারা আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বার্মাতে জঙ্গি প্রশিক্ষণ নিয়েছে তাদের বয়স তো এখন হবে ৪৫-৫৫ বছর– তারা কোথায়? আর যারা ১৯৭১-এ আলবদর-আলশামস-রাজাকার-শান্তিকমিটির নামে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিলেন এবং/অথবা সরাসরি খুন-হত্যা-জখম-ধর্ষণ-অগ্নিসংযোগে জড়িত ছিলেন, এবং/অথবা মুখ্য পরামর্শদাতার কাজ করেছিলেন তাদের বয়স তো এখন ৬০-৮৫ বছরের মধ্যে— তারা কোথায়? এসব গডফাদারদের বড় অংশই ১৯৭১-এ মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধ করেছেন। এসব গডফাদারদের অনেকেই এখনও বহাল তবিয়তে দেশ-বিদেশে তাদের কাজ

চালিয়ে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করারও এ এক নবতর কৌশল হতে পারে। মহাবিপর্যয়টি এখানেও।

মৌলবাদী জঙ্গিত্ব শুধু যে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে তাই নয়। ইসলাম ধর্মের নামে উগ্রবাদী মতাদর্শটি তার *'logos'* বা ইহলৌকিক যুক্তির দিক থেকে যথেষ্ট 'বাস্তববাদী' কৌশলিক অবস্থান গ্রহণ করেছে। ওদের মূলধারার রাজনৈতিক দল অর্থাৎ ইসলামি জঙ্গিবাদের কর্পোরেট হেডকোর্য়াটার জামায়াত-ই-ইসলামী বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ বিগত কয়েকবছর এসব নিয়ে "কূটনৈতিক দৃষ্টিতে বাস্তবানুগ" রাজনৈতিক বক্তব্য-বিবৃতি প্রদান করেছেন। যেমন অন্যান্য অনেক "নীতিগত" কৌশলিক বক্তব্যের মধ্যে তারা বলেছেন:

১. "ইসলাম ধর্মমতে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দেশে নারী নেতৃত্ব স্বীকৃত নয়, তবে নারী নেতৃত্ব জায়েজ যদি ঐ নেতৃত্ব আমাদের সাথে ক্ষমতার ভাগাভাগি করে"।

২. "সুদ খাওয়া ইসলামে হারাম। তবে আমাদের নিয়ন্ত্রিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান যদি ভিন্ন কোনো নামে সুদ-জাতীয় কোন কিছু খাই তাতে অসুবিধা নেই"।

৩. "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র - ইসলামের শত্রু। তবে ইরাকে মার্কিনি আগ্রাসনে কোনো সমস্যা নেই যদি আমাদের দেশে (বাংলাদেশে) আমরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকি"।

৪. "ভারত একটি শত্রু রাষ্ট্র। তবে ভারতের সাথে অন্যায়-অন্যায্য দ্বি-পাক্ষিক কোনো চুক্তি স্বাক্ষরে অসুবিধা নেই যদি এদেশে (বাংলাদেশে) আমরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকি"।

ধর্মীয় মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের আস্ফালন যে সবধরণের সভ্য-আচরণ মাত্রা অতিক্রম করেছে এবং তাতে আমাদের মুক্তি-স্বাধীনতা বিরোধী আন্তর্জাতিক চক্র মদত দিয়ে চলেছে (যে বিষয়টি আমি ইতোমধ্যে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি)-এর সর্বশেষ প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ট্রাইবুনালের রায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ডের বিরূদ্ধে মার্কিন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ও ব্রিটেনের সংসদ সদস্য লর্ড কার্লাইল সাহেবের অবস্থান; অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে যখন যুদ্ধাপরাধী– এ দেশে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই প্রধান সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরিকে ওরাসহ অ্যামানেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল-এর মত সংস্থা রক্ষার চেষ্টা করে আমাদের ট্রাইবুনাল নিয়ে শুধু প্রশ্ন উত্থাপনই করে নি বিচারকাজ বেঠিক হয়েছে অথবা ঠিক হয় নি বলে স্পষ্ট রায় দেবার মত ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে। আর মৌলবাদী জঙ্গিদের অর্থায়নের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি–যুদ্ধাপরাধী মির কাশেম আলি তো বাঁচবার জন্য ওয়াশিংটনভিত্তিক লবিষ্ট ফার্মকে তিন দফায় ৫০০ কোটি টাকার উপর প্রদান করেছে। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় একটু খোলাসা করা প্রয়োজন।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে ট্রাইব্যুনালের রায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত জামায়াতে ইসলামির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে রিভিউ আবেদন সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রেখেছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত ৬ এপ্রিল (২০১৫)। আর সাথে সাথে একই দিনে কোনো কালক্ষেপণ না করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কভিত্তিক আন্তর্জাতিক এনজিও হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (যার প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৭৮ সাল, যার ঘোষিত মূল কাজ মানবাধিকার নিয়ে গবেষণা ও এডভোকেসি এবং যার প্রতিপালনে অর্থের প্রধান উৎস জর্জ সোরোস ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশন যারা প্রাক্তন কম্যুনিষ্ট দেশগুলোতে অতিমাত্রায় সক্রিয়) এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ

হাউস অব লর্ডসের সদস্য লর্ড কার্লাইল (যিনি ১৯৯৪ সালে ব্যারিষ্টারি পাশ করেন, ১৯৯৯ সালে লর্ড উপাধি পান, ২০০১-১১ পর্যন্ত সময়কালে সন্ত্রাসবাদ বিষয়ক আইনি প্রক্রিয়ার সাথে এবং ২০০৮ সালে জাতীয় প্রতিরক্ষার সাথে সম্পৃক্ত, যিনি উইনস্টেই গ্রুপের একজন শেয়ার হোল্ডার এবং মধ্যপ্রাচ্যের কাতার ইনভেষ্টমেন্ট অথরিটি যার ক্লায়েন্ট)— উভয়েই চরমতম মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী যুদ্ধাপরাধী মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড স্থগিত করার জন্য সরকার বরাবর আহ্বান জানিয়েছেন। ব্যারিষ্টার লর্ড কার্লাইল সাহেব কামারুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রাখায় অসন্তোষ প্রকাশ করে মৃত্যুদণ্ড স্থগিত করার আহবান জানিয়েছেন; ব্যারিষ্টার লর্ড কার্লাইল সাহেব সরকারের প্রতি এ আহ্বানও জানিয়েছেন যে "বাদীপক্ষের কৌসুলির আচরণ বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত, এবং ঐ তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালের সব বিচারপ্রক্রিয়া স্থগিত রাখা উচিত"। বিশ্বপ্রভূ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের "মানবাধিকার সংস্থা"(!) আর ঐ বিশ্বপ্রভুর উপ-প্রভু ব্রিটিশ লর্ড সাহেবদের একই সাথে একই সময়ে যুদ্ধাপরাধী বিচার প্রক্রিয়ার রশি টেনে ধরার উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট অনুধাবনে অন্তত দুটো বিষয় মনে রাখা উপকারী হবে। প্রথমত: নিউইয়র্কভিত্তিক হিউম্যান রাইটস ওয়াচ নামক আন্তর্জাতিক এনজিও-টি তাদের কাগজে কলমে বলে যে তারা আন্তর্জাতিক আইনের নিরিখে পৃথিবীর কোথাও মানবাধিকার লঙ্ঘন হলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও এডভোকেসি করবে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক কোর্টের সিদ্ধান্ত এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে (যে লঙ্ঘনকে বলা হয়েছিল "মানবাধিকার লঙ্ঘন"; "যুদ্ধাপরাধতুল্য", "আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদতুল্য") একক সিদ্ধান্তে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ইরাক দখল করল, বিনাবিচারে সাদ্দাম হোসেনকে হত্যা করলো, লিবিয়ায় বোমা মেরে দেশটিকে ছিন্নভিন্ন করে ছাড়লো এবং গাদ্দাফিকে বিনা বিচারে হত্যা করলো তখন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ আর লর্ড কার্লাইল সাহেবরা কোথায় ছিলেন? কোনো টু শব্দটি তো করেননি, উল্টো এসবে সমর্থন দিয়েছিলেন। একাত্তরের খুনিদের বিচার নিয়ে আমাদের ট্রাইব্যুনাল ও সুপ্রিম কোর্ট যে সব রায় দিচ্ছে সেসব নিয়ে আপনাদের আসলে কোনো কিছু বলার কোনো ধরনের নৈতিক ও মানসিক অধিকারই নেই। দ্বিতীয়ত: বহু বছর ধরে তথ্য প্রমাণসহ আমি বলে আসছি যে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী-মানবতা বিরোধী অপরাধীরা বর্তমান সরকারকে উচ্ছেদ করতে ইতোমধ্যে বহু ধরনের চেষ্টা করেছে (স্মরণ করুন ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিডিআর-এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড) এবং একই সাথে তথ্য প্রমাণ দিয়েছি যে যুদ্ধাপরাধী এবং তাদের রাজনৈতিক দল ইতোমধ্যে মার্কিন মুল্লুকে হাজার কোটি টাকার বিনিময়ে লবিষ্ট নিয়োগ করেছে এ কথা প্রমাণ করতে যে তাদেরকে যেন নিরাপরাধ প্রমাণে বিশ্বব্যাপী তদবির জোরদার করা হয় (ওয়াশিংটনভিত্তিক লবিষ্ট ফার্ম ক্যাসিডি ইন্টারন্যাশনালের সাথে মির কাশেম আলির চুক্তি কি যথেষ্ট প্রমাণ নয়?)। মার্কিন মুল্লুকের হিউম্যান রাইটস ওয়াচ আর ব্রিটিশ লর্ডদের সাথে তর্কে যাবার আমার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে মানুষ হিসেবে ওদের প্রতি আমার একটা সনির্বন্ধ অনুরোধ আছে। অনুরোধটা হল মাত্র দুই মিনিট সময় দিন, দয়া করে পড়ুন একাত্তরের খুনি মু. কামারুজ্জামান যা যা করেছিলো তার মধ্যে মাত্র একটা নমুনা (আশা করি পড়বেন এবং তারপরে যা বলার বলবেন!)। দয়া করে পড়ুন তাহলে কামারুজ্জামানের ফাঁসির রায় বহাল রাখার পরে শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ির সোহাগপুর গ্রামের বিধবাপল্লির বাসিন্দা জোবায়দা খাতুনের প্রতিক্রিয়া (পড়ুন, বারবার পড়ুন, যতক্ষণ না বুঝবেন ততক্ষণ পড়ুন):

> "আমি তহন ছয় মাসের পোয়াতি (গর্ভবতী)। পাক সেনারা চোখের সামনে গুলি কইরা আমার স্বামীডারে মাইরা ফালায়। জানুয়ারগরের অত্যাচারে পেটের বাচ্চাডাও নষ্ট অইয়া যায়। এরা চইলা গেলে নিরুপায় অইয়া গোসুল ছাড়াই স্বামীরে উডানে (বাড়ির

আঙ্গিনায়) কব্বর দিছি। পরে দুই পুলাপান লইয়া অসস্থ সইলে গ্রাম ছাড়ি। কম বয়সে বিধবা অইছি, স্বামীর আদর কি জিনিস বুঝবার পাই নাই। তারাও বুঝব বিধবা অয়নের কি কষ্ট।... স্বামী মইরা যাওয়নের পর ২২ দিন জাউ খাইয়া থাকছি। ভাতের অভাবে মেয়েডা মইরা যায়। পরে অসুস্থ সইল লইয়া বাড়ি বাড়ি কাম করছি। শেষে ভিক্ষা কইরা চলছি। শুধু এই দিনডা দেহুনের লাইগা আল্লাহ আমগরে বাঁচাইয়া রাখছে। কামারুজ্জামানের ফাঁসি অইব এই খবরেই আমরা বিরাট খুশি অইছি। কামারুজ্জামানের ফাঁসি অইলে আমার স্বামী-সন্তানের আত্মা শান্তি পাইব।" একই গ্রামের আরেকজন স্বামীহারা করফুলি বেগম (৭০) বলেন "সাক্ষী দেওয়ার পর থাইকা রাতে ঘরের চালে কে বা কারা ডেল মারত। এলাকার লোকজন ডর (ভয়) দেহাইত। সরকার বইদলা (পরিবর্তন) গেলে নাহি, আমগর উল্ডা বিচার করব। এর লাইগা সবসুমু ভয়ে ভয়ে থাকতাম। ফাঁসির রায় বহাল থাহায় আমগর মনে স্বস্তি ফিইরা আইছে। কামারুজ্জামানের ফাঁসি অইলে আমগর আত্মা শান্তি পাইব।" এখানে উল্লেখ জরুরি যে একাত্তরের ২৫ জুলাই সোহাগপুর গ্রামে কামারুজ্জামানের নেতৃত্বে আলবদর, রাজাকার ও পাকিস্তানি বাহিনী নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ ও ধর্ষণ করে। বেনুপাড়ার সব পুরুষকে (১৮৭ জন) হত্যা করে পাড়াটিকে পরিণত করা হয় বিধবাপল্লিতে। সেদিন যে ৫৭ জন বিধবা হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে জোবায়দাসহ ৩০ জন এখনো বেঁচে আছেন। (দৈনিক প্রথম আলো, ৮ এপ্রিল, পৃঃ ২)।

আমাদের দেশে ইসলামি জঙ্গিত্বের মহা-ভয়াবহ মহা-বিপযর্য়কর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন (বলা যেতে পারে প্রশ্নগুচ্ছ) নিয়ে তেমন কোনো গবেষণা অথবা অনুসন্ধানধর্মী কাজ হয় নি। অগবেষিত অথবা স্বল্প গবেষিত এ প্রশ্ন বা প্রশ্নগুচ্ছ হলো:

(১) ইসলামি জঙ্গিবাদ অথবা একই কথা ইসলামি জঙ্গি সংগঠনসমুহের বিকাশের উত্তরণ পযার্য়সমুহ (transformative phases) কি কি এবং এর বৈশিষ্ট্যসূচক নিদের্শকসমূহ কি কি?

(২) ইসলামি জঙ্গিবাদ অথবা ইসলামি জঙ্গিত্ব তার বিকাশে এখন জিহাদের কোন স্তরে অবস্থান করছে এবং কেনো?

(৩) এ দেশের ইসলামি জঙ্গিদের সাথে আন্তজার্তিক জঙ্গি সংগঠন আল কায়েদার কোন সম্পর্ক আছে কিনা?

এসব প্রশ্নগুচ্ছ নিয়ে প্রথমেই বলে রাখা উচিত যে ইসলামি জঙ্গি সংগঠনসমূহ (বাংলাদেশে এ সংখ্যা ১৩২টি; দেখুন পরিশিষ্ট ১) একদিকে যেমন নির্ভেজাল বাস্তবতা (যা সারণি ৪ ও ৫-এ দেখানো হয়েছে) অন্যদিকে তারা অতি-গোপন সংগঠন যে গোপনিয়তা যথেষ্ট দুর্ভেদ্য। ইসলামি জঙ্গি সংগঠনসমুহের মিশন, ভিসন, গঠন প্রক্রিয়া, কর্মপ্রণালি, সাংগঠনিক কাঠামো, অর্থ ও অস্ত্রের উৎস, অস্ত্র প্রশিক্ষণ, টার্গেট নির্দ্ধারণ প্রক্রিয়া ও তার বাস্তবায়ন পরিকল্পনা পদ্ধতি, জঙ্গিদের পারস্পরিক সম্পর্ক — এসব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যথেষ্ট মাত্রায় সীমিত — এমনই সীমিত যা দিয়ে ইসলামি উগ্রবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্ব মোকাবেলা করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। এসব নিয়ে ক্ষেত্র বিশেষে অনুমাননির্ভর (speculation) হওয়া ছাড়া পথ থাকে না। এসব নিয়ে আছে যথেষ্ট মাত্রায় বিভ্রান্তি (confusion অর্থে), আছে হয় অতিমুল্যায়ন নয় অবমুল্যায়ন, আছে অনেক অনুদঘাটিত বিষয়াদি (যা উদঘাটন সমজসাধ্য নয়), আছে

এমনসব বিষয়াদি যা ঘটনা ঘটে যাবার বহু পরে উদঘাটিত হয় যখন উদঘাটন করে তেমন কোনো লাভ হয় না, আর সবশেষে আছে "অনেক অজানা — অজানা বিষয়াদি" (many unknown unknowns)। এসব কারণে উল্লিখিত প্রশ্নসমুহের যুক্তিসম্মত সদুত্তর দেয়া খুব সহজ নয়। এজন্যই সংশ্লিষ্ট এ বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে একদিকে যেমন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছি আর অন্যদিকে যুক্তিবিজ্ঞান ভিত্তিক বিমূর্ততা (scientific abstraction)-এর আশ্রয় নিয়েছি। সামাজিক গবেষণার এসব পদ্ধতি অবলম্বনে উত্থাপিত প্রশ্নগুচ্ছের উত্তরে যা পেয়েছি তা নিম্নরূপ[৩২]:

প্রথমত, শুরু করা যাক ইসলামি জঙ্গিত্বের আন্তর্জাতিক হেড কোয়ার্টার আল-কায়েদা দিয়ে। ১৯৯৫-১৯৯৭ সালে আল-কায়েদা তাদের খসড়া মাস্টার প্লান (মহাপরিকল্পনা) প্রণয়ন করে যা পরবর্তী সময়ে (২০০২ সালের দিকে) চুড়ান্ত করে তারা বলে যে তাদের মূল লক্ষ্য: "পৃথিবীর অনেক দেশে ইসলামি শরিয়াহ ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন করতে হবে"। আল-কায়েদার চুড়ান্ত মাস্টার প্লানে সময়-নির্দিষ্ট (time bound) করে সংশ্লিষ্ট যা যা বলা হয়েছে সে সবের মূল বিষয়াদি এরকম:

১. বিশ্বব্যাপি ইসলামি শরিয়াহ ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের জিহাদি সংগ্রামে পাঁচটি কালপর্ব (phase) থাকবে: ২০০০-২০০৩ (প্রথম পর্ব), ২০০৩-২০০৬ (দ্বিতীয় পর্ব), ২০০৬-২০০৯ (তৃতীয় পর্ব), ২০০৯-২০১২ (চতুর্থ পর্ব), ২০১৩-২০২৬ (পঞ্চম পর্ব)।

২. পঞ্চম পর্বের শেষে অর্থাৎ ২০২৫-২০২৬ সাল নাগাদ পৃথিবীর সকল মুসলিম অধ্যুষিত দেশে 'খেলাফত' প্রতিষ্ঠিত হবে।

৩. পৃথিবীর কোন দেশই ১০০ বছরের উর্ধ্বে ইসলামি খেলাফতবিহীন অবস্থায় থাকবে না। এ ক্ষেত্রে সময়-নির্দিষ্ট ভবিষ্যত প্রক্ষেপণে তারা হাদিস থেকে যে বিষয়টি উদ্ধৃতি করেন তা হলো, "যেহেতু আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বশেষ ইসলামী খেলাফত ১৯২৪ সালে হযরত ওসমানের আমলে বিলুপ্ত ঘোষিত হয় সেহেতু তার ১০০ বছর পরে অর্থাৎ ২০২৫-২০২৬ সাল নাগাদ অবশ্যই আবারো খেলাফত-শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমাদের সকল কার্মকাণ্ড সে লক্ষ্যেই পরিচালিত হতে হবে"।

৪. তালেবানদেরকে ২০১৬ সালে আবারো আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতা দখল করতে হবে (অর্থাৎ মাস্টার প্লানের ৫-ম কালপর্বের শুরুর দিক)

৫. আফগানিস্তান পুনর্দখল প্রক্রিয়ায় এক "ভীতি বলয়" (threat belt) সৃষ্টি করতে হবে। এই "ভীতি বলয়ে"-র অন্তর্ভুক্ত হবে ভারত (বিশেষত কাশ্মির, আহমেদাবাদ, গুজরাট এবং 'সাত বোন'– আসাম, অরুণাচল, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড মনিপুর, মিজোরাম এবং ত্রিপুরা আর ২০১৮ সালের মধ্যেই ঐ 'সাত বোন'কে যথেষ্ট মাত্রায় অস্থিতিশীল করতে হবে), বার্মা (বিশেষত: রোহিঙ্গাসহ আরাকান রাজ্য), এবং বাংলাদেশ (আল-কায়েদার পরিকল্পনা মতে প্রধানত সমুদ্র সম্পদ ও ভৌগলিক-রাজনৈতিক বিবেচনায়)।

---

[৩২] আবুল বারকাত, ২০১৫, A Political Economy Treatise on Religious Fundamentalism and Extremism: A high probability global catastrophe with reference to Bangladesh. Lead Speaker's Paper for the workshop *"Countering Religious Extremism in South Asia",* IISS, London, United Kingdom. 09 September 2015.

৬. দু'টো 'মানামা' অর্থাৎ বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত করতে হবে। প্রথম "মানামা" হবে "হিন্দ এলাকায়" যার মধ্যে থাকবে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, বার্মা, নেপাল, ভুটান, আফগানিস্তান। আর দ্বিতীয় "মানামা" হবে "শ্যাম এলাকায়" যার মধ্যে থাকবে সিরিয়া, জর্দান, প্যালেস্টাইন ও তৎসংশ্লিষ্ট ভৌগলিক এলাকাসমূহ।

৭. আল-কায়েদার মহাপরিকল্পনা (Master Plan)-য় উল্লেখ করা হয়েছে যে এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ইসলামি জিহাদিদের জিহাদের[৩৩] চারটি স্তর (4 stages of Jihad) পর্যায়ক্রমে অতিক্রম করতে হবে। অবশ্য তারা এ কথাও বলেছেন যে পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে এমনও হতে পারে যে কোন নির্দিষ্ট স্তর বাদ দিয়েই একলাফে পরবর্তীস্তরে যাওয়া সম্ভব। জিহাদের ঐ চারটি স্তর হলো যথাক্রমে **"দাওয়া"** অর্থাৎ সব পথ-পদ্ধতি অবলম্বনে মানুষদের দাওয়াত দিয়ে তাদের বাণী-বক্তব্য পৌছে দেয়া; **"ইদাদ"** সব ধরনের প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিপালন করা; **"রিবাত"** অর্থাৎ ছোট-ছোট এবং বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ - হামলা কার্য পরিচালন করা; এবং সর্বশেষ স্তর **"কিলাল"** অর্থাৎ বড় মাপের সশস্ত্র সম্মুখ যুদ্ধ।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের ইসলামি জঙ্গি সংগনের বিকাশস্তর এবং তাদের সাথে ইসলামি জঙ্গিবাদের আন্তর্জাতিক হেড কোয়ার্টার আল-কায়েদার যোগসূত্র সংশ্লিষ্ট বিষয়। ইতোমধ্যে পরিশিষ্ট ১-এ উল্লেখ করেছি যে আমাদের দেশে জানামতে ১৩২টি ইসলামি জঙ্গি সংগঠন আছে এবং সেই সাথে দেখিয়েছি (সারণি ৪ ও ৫) যে তারা ইতোমধ্যে কতধরণের জঙ্গিত্ব সংঘটিত করেছে। আমার মতে সময়কালের নিরিখে বাংলাদেশে ইসলামি জঙ্গি-উগ্রবাদী সংগঠনসমূহের বিকাশকে চারটি স্তর বা পর্যায়ে (phases of transformation) ভাগ করা যায়। যে চারটি উত্তরণ-বিকাশ স্তর হলো এরকম: ১৯৯২-১৯৯৬ (প্রথম স্তর বা প্রথম কালপর্ব), ১৯৯৭-২০০৬ (দ্বিতীয় স্তর বা দ্বিতীয় কালপর্ব), ২০০৭-২০১২ (তৃতীয় স্তর বা তৃতীয় কালপর্ব), ২০১৩-এবং সামনের দিক (চতুর্থ স্তর বা চতুর্থ কালপর্ব)। আমাদের দেশে ইসলামি জঙ্গিবাদ-এর ছোট থেকে বড় হওয়ার যে চারটি বিকাশকাল অথবা উত্তরণকাল তার মূল বৈশিষ্ট্যসহ কালসমূহ নিচের ছক ৩-এ দেখানো হয়েছে।

তৃতীয়ত, বাংলাদেশে ইসলামি জঙ্গিবাদ এখন জিহাদের কোন স্তর বা পর্যায়ে অবস্থান করছে? এ প্রশ্ন নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে খুব একটা ভাবনা-চিন্তা হয় কি-না সে বিষয়ে আমার সম্যক জানা নেই – যদিও জানতে চেষ্টা করেছি; এ নিয়ে অনেকের মধ্যে বেশ আত্মতুষ্টিও লক্ষ্য করেছি যারা বলেন "ওরা বেশি দূরে এগুতে পারবে না"; অবশ্য কেউ কেউ বলেন ওরা ইসলামি জঙ্গিবাদ বিকাশের মোটামুটি প্রাথমিক স্তর বা প্রাথমিক পর্বের আশেপাশে অবস্থান করছে। এ দেশে ইসলামি জঙ্গিবাদ ও তাদের সশস্ত্র অবস্থা-অবস্থান আর পাশাপাশি ইসলামি জঙ্গিত্বের বৈশ্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতি ও মহাপরিকল্পনা যা তা দিয়ে বিচার করলে আমি অবশ্যই যুক্তিগত কারণেই বলবো ওরা বহুদূর এগিয়েছে, ওদের বিকাশ-বিস্তৃতি-অবস্থান অনেকেরই ধারণার বাইরে হতে পারে। ছক ৩-এ দেখিয়েছি যে ২০১৩ সাল থেকে এ দেশে ইসলামি জঙ্গিবাদ এখন তাদের বিকাশের চতুর্থ স্তর বা চতুর্থ পর্বে অবস্থান করছে, যে পর্বটি যে কোন মানদণ্ডেই মারাত্মক-মহাবিপর্যয়কর এক ভবিষ্যত অবস্থার লক্ষণ মাত্র (কাউকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার লক্ষ্যে

[৩৩] অবশ্য আগেই উল্লেখ করেছি পবিত্র কোরআন শরিফে 'জিহাদ' বলে কোন কিছুর উল্লেখ নেই, যা আছে তা হলো আত্মরক্ষার স্বার্থে "পবিত্র যুদ্ধ"। মুসলিম শাসকরা যখন সাম্রাজ্যবিস্তারে যুদ্ধ করে তখন "পবিত্র যুদ্ধ" শব্দটি পাল্টে তার পরিবর্তে 'জিহাদ' শব্দ ব্যবহার শুরু করেন।

ছক ৩: বাংলাদেশে ইসলামিক জঙ্গিবাদী সংগঠনসমূহের বৈশিষ্ট্যসহ বিকাশকাল

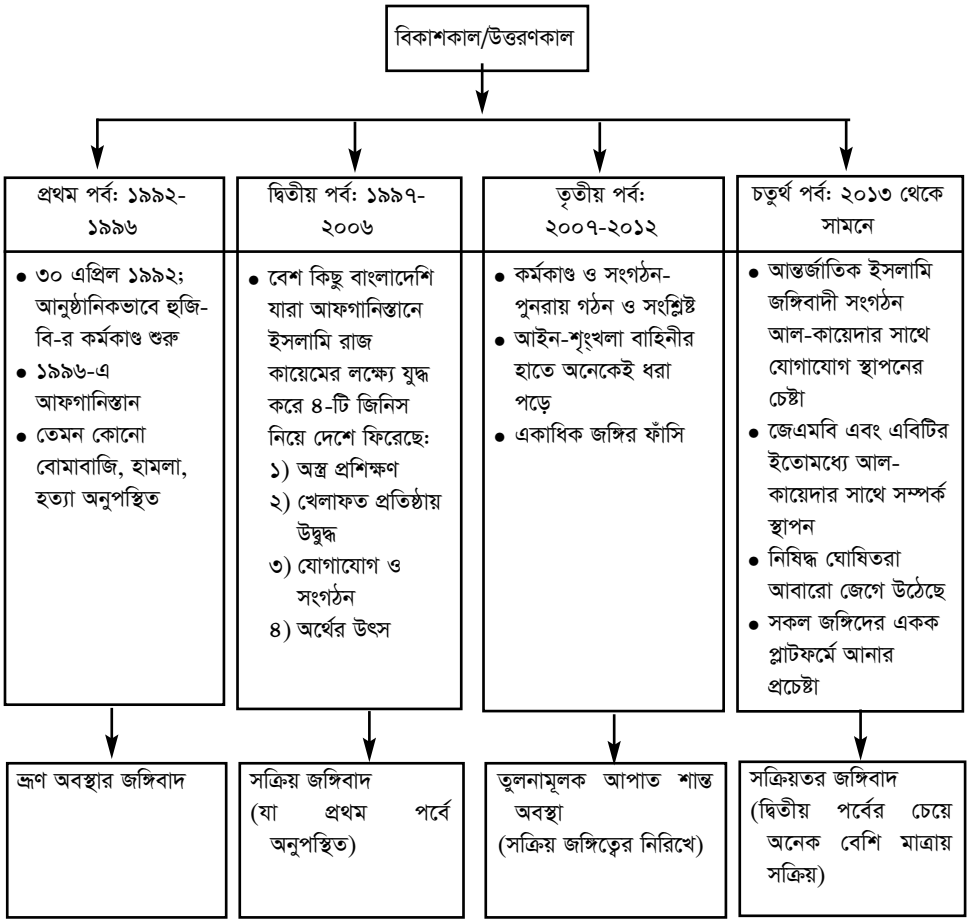

এসব বলছি না)। মারাত্মক ও মহাবিপর্যয়কর বলছি এ কারণে যে আমি নিশ্চিত; (১) সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত জেএমবি এবং আনসারুল্লাহ বাংলাটিম ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক মহা-জঙ্গি সংগঠন আল-কায়েদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে ফেলেছে। এবং আল-কায়েদা থেকে তারা অস্ত্র সরবরাহ, বোমা প্রস্তুত পদ্ধতি, অস্ত্র প্রশিক্ষণ (ম্যানুয়ালসহ), টার্গেট নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নে গেরিলা কায়দা-কানুন, অর্থ সরবরাহ, অর্থের উৎস পোক্তকরণ, নিরীহ মুসলমানদের জিহাদের পক্ষে আনার 'বিজ্ঞান সম্মত' পথ পদ্ধতি, প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি পাচ্ছে; (২) তারা ইতিমধ্যে শুধু আল-কায়েদাই নয় অনুরূপ অন্যান্য বিদেশি জঙ্গি সংগঠন-সংস্থা-প্রতিষ্ঠান-ট্রাস্ট-ফাউন্ডেশন-বেসরকারি সংস্থা-মিডিয়ার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছে এবং ওদের পরামর্শে সক্রিয়; (৩) হিজবুত তাহরিরসহ আরো কিছু নিষিদ্ধ অথবা এখনও নিষিদ্ধ হয় নি এমন সব জঙ্গি সংগঠনও অনুরূপ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে; (৪) নিষিদ্ধ ঘোষিত জেএমবি এবং আনসারুল্লাহ বাংলাটিমসহ বেশ কিছু ইসলামি জঙ্গি সংগঠন দেশের সকল ইসলামি জঙ্গি সংগঠনসহ ইসলামি জঙ্গিবাদ সমর্থনকারী সকল সংগঠন-সংস্থা-প্রতিষ্ঠানকে (মৌলবাদের অর্থনীতির প্রতিষ্ঠানসহ) একক একটি প্লাটফর্মে দাঁড় করানোর সক্রিয় চেষ্টা করছে; (৫) এদেশের সকল

ইসলামি জঙ্গি সংগঠন আল-কায়েদার মাস্টার প্লান বা মহাপরিকল্পনা ধারণ করে অর্থাৎ ওদের সবাই বিশ্বাস করে যে ইসলামি শরিয়াহভিত্তিক খেলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই; (৬) ওরা যখন যেভাবে যে সব বর্বরতম নৃশংস পথ-পদ্ধতি অবলম্বনে মুক্তচিন্তার মানুষ খুন-হত্যা-জখম করছে, অথনীতির প্রাণ সংযোগসমূহ বিনষ্ট করে অর্থনীতিকে বিকল করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, প্রশাসন-আদালত-বিমান প্রতিষ্ঠান-দেশজ/সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান (প্রাতিষ্ঠানিক উৎসব) ও ব্যক্তি হত্যায় উদ্যত – এসবই তো যথেষ্টমাত্রায় প্রমাণ করে যে বাংলাদেশে ইসলামি জঙ্গিত্ব বিকাশ স্তরের মানদণ্ডে প্রাথমিক কোনো পর্যায়ে অবস্থান করছে না। এদেশে ইসলামি জঙ্গিবাদ 'দাওয়া' স্তর পার হয়েছে, অতিক্রম করেছে দ্বিতীয় স্তর 'ইদাদ', এখন তাদের অবস্থান জিহাদের তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরের মধ্যবর্তী কোন পর্যায়ে অর্থাৎ 'রিবাত' ও 'কিলাল'-এর মাঝে কোন এক পর্যায়ে। তবে সবকিছু বিচার বিশ্লেষণে আমি মনে করি তাদের অবস্থান জিহাদি সর্বশেষ পর্যায় "কিলাল"-এর কাছাকাছি অর্থাৎ তারা ইসলামি শরিয়াহ ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে সশস্ত্র সম্মূখ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী রাজনীতি ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্ব কোনো দুর্বল প্রতিপক্ষ নয় এ জন্যেও যে তারা ইসলামের মুলমন্ত্র পরিত্যাগ করে "অর্থনৈতিক ক্ষমতাভিত্তিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া"-কে (economic power based political process) রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। ধর্মকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের এ কৌশল আসলে ধর্মের *'mythos'*-এর সাথে বাস্তবের *'logos'*-এর সম্মিলনের এক আধুনিক পদ্ধতি মাত্র (খোমেনি পদ্ধতি)। এ পদ্ধতিতে ধর্মকে "রাজনৈতিক মতাদর্শে" রূপান্তর করা হচ্ছে। ধর্মভিত্তিক এ রাজনৈতিক মতাদর্শ ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত।

ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদ-মৌলবাদী জঙ্গিত্ব ও মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতি বিশ্লেষণ করে এখন থেকে দশবছর আগেই হুশিয়ারি প্রক্ষেপণ করে লিখেছিলাম, সমগ্র বিষয়টি দাঁড়িয়েছে এরকম: *"স্বাধীনতা ও মুক্ত চিন্তার প্রতিপক্ষ সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তি জানে তারা কি চায়, বিপরীতে আমরা জানি না আমরা কি চাই; ওরা জানে কেমন করে তা অর্জন করবে, বিপরীতে আমরা জানি না; ওরা তাদের লক্ষ্যার্জনে সুসংগঠিত, আমরা অসংগঠিত; লক্ষ্যার্জনে ওদের মধ্যে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই, বিপরীতে আমাদের দ্বিধা আছে; ওরা যা করছে তা তারা গভীরভাবে বিশ্বাস করে, আর আমরা নিজেদের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছি বলে মনে হয়; ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, যুবসমাজের বেকারত্ব হতাশাকে ওরা সংকীর্ণ স্বার্থে কাজে লাগাতে সিদ্ধহস্ত, আর আমরা "দরিদ্র মানুষ-যুব বেকার-হতাশা"-র বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম এড়িয়ে চলেছি। আমাদের অস্বচ্ছতা ও অনৈক্য ওদের ভিত শক্তিতে সহায়ক হচ্ছে"*।[৩৪]

[৩৪] বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, "গভীর ষড়যন্ত্রের পথ ধরে দেশ গাঢ় অন্ধকারের দিকে এগুচ্ছে", দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ আগস্ট ২০০৪। এই লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিলো ২০০৪ সালের ২১ আগস্টের ঠিক আগের দিনে, যে দিন তৎকালিন বিরোধী দলীয় নেতা শেখ হাসিনার ঢাকার জনসভায় জঙ্গিরা গ্রেনেড হামলা করে। যে হামলায় নিহত হন ২৪ জন আর চির পঙ্গুত্বসহ মারাত্মক আহত হন ৫০৩ জন।

৮. "ধর্ম ও ব্রেইন": স্নায়ুতান্ত্রিক বা মনোজাগতিক ধর্ম দর্শন-এর যে বিষয়টি বোঝা জরুরি

ধর্ম, ধর্মানুভূতি, ধর্মান্ধতা, ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদী জঙ্গিত্ব - এসব নিয়ে বিগত প্রায় ২০ বছরের গবেষণায় আমি এ উপসংহারে উপনীত হয়েছি যে এসবের পিছনের অর্থনীতি, রাজনীতি, রাজনৈতিক অর্থনীতির বিচার-বিশ্লেষণ– সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির "পূর্ণাঙ্গ মর্মার্থ" বুঝতে সহায়ক নয়। এ বিষয়ে বিগত ২০ বছরের অনুসন্ধান কাজ ব্যর্থ হয়নি। তা বিষয়সমূহের কারণ-পরিণাম বুঝতে বেশ সহায়ক হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে ৫০-৬০ ভাগ সহায়ক হয়েছে। কারণ-পরিণাম সংশ্লিষ্ট বাদবাকি ৪০-৫০ ভাগ অনুধাবন সম্ভব হয় নি। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো এই যে এ বিষয়ে অর্থনীতি, রাজনীতি ও রাজনৈতিক অর্থনীতিক গবেষণা যে বিষয় বুঝতে যথার্থ মাত্রায় সহায়ক হয় নি বলে মনে হয় তা হলো ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্ব থেকে মুক্তি পাবার জন্য করণীয়সমূহ কি হবে? কি এবং কেমন হতে পারে উত্তরণের পথনির্দেশ? আর এ জন্যই খুবই জরুরি অথচ তেমন গবেষিত নয় অথবা উপেক্ষিত অথবা কেউই তেমন আমল দেন নি "Neurotheology" অর্থাৎ "ধর্মের সাথে মানুষের ব্রেইন"-এর সম্পর্ক (অর্থাৎ স্নায়ুতান্ত্রিক বা মনোজাগতিক ধর্মদর্শন) নিরুপণের প্রয়াস নিয়েছি। বিষয়টি বৈজ্ঞানিক, তবে শুধু মনস্তাত্ত্বিক নয় এজন্য যে মানুষের ব্রেইন একদিকে যেমন জটিল এবং স্নায়ুবিজ্ঞানীদের মতে এখনও পর্যন্ত বহুলাংশে দুর্বোধ্য আর অন্যদিকে মানুষ যে যুগে যে কালে যে অবস্থায় যা কিছু ভাবনা-চিন্তা করে তা তার পরিবেশ-প্রতিবেশ পারিপার্শ্বিকতাসহ সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অনেক উপাদান দিয়ে গঠিত। এক্ষেত্রে সাধারণীকরণ (generalization) করলে তা হবে অবৈজ্ঞানিক, অবাস্তব, বাস্তবতা বিবর্জিত তত্ত্বাগিশতা মাত্র।

প্রথমেই "ধর্ম আর ব্রেইন" বিষয়টির মূল প্রশ্নাদি উত্থাপন করা যাক। "স্নায়ুতান্ত্রিক বা মনোজাগতিক ধর্মদর্শন" বিজ্ঞানে যেসব প্রশ্নের অনুসন্ধান জরুরি তা হলো:

(১) পৃথিবীতে এখন ১০ হাজারের বেশি ধর্ম আছে। কী সে কারণ যা পৃথিবীতে এত মানুষকে ধর্ম পালনে উদ্বুদ্ধ করে?

(২) ধর্মের বিবর্তনগত সুবিধাসমূহ কী কী?

(৩) ধর্ম পালনকারী মানুষের মস্তিষ্ক কোষ (religious brain) কিভাবে কাজ করে? এখানে মনে রাখা জরুরি যে একজন মানুষ জন্মসূত্রেই যেমন কোনো না কোনো ধর্মাবলম্বী আবার মাতৃগর্ভ থেকে শুরু করে শিশুকালেই "মস্তিষ্কের ধর্মভিত্তিক প্রোগ্রামিং" এর কাজ শুরু হয়। সুতরাং মানুষের ব্রেইন নিয়ে স্নায়ুবিজ্ঞানের এসব অনুসন্ধানফল অগ্রাহ্য করলে আর যাই হোক একদিকে যেমন বোঝা সম্ভব হবে না যে মানুষ কেন ধর্মীয় জঙ্গিত্বের আশ্রয় নেন আর অন্যদিকে সমাজ প্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় সমাধানের পথও খুঁজে পাওয়া যাবে না।[৩৫]

পৃথিবীতে এখন ৮০০ কোটি মানুষের বাস। এই ৮০০ কোটি মানুষের সম্ভবত প্রায় সবাই শান্তিতে বসবাস করতে চাই এবং চাই জীবন-সমৃদ্ধি— একক ব্যক্তি সত্তা হিসেবে এবং সমাজবদ্ধ মানুষ

[৩৫] "Understanding Neurotheology Matters in Countering Religious Extremism: Religion and Brain" বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গবেষণায় এক নবতর সংযোজন। "ধর্মীয় ব্রেইন" বিষয়টি সকল ধর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং বিগত ৫০০ বছরে "religious brain" কিভাবে কাজ করেছে সে বিষয়ে সংক্ষেপে জানতে দেখুন, আবুল বারকাত, ২০১৫, A Political Economy Treatise on Religious Fundamentalism and Extremism: A high probability global catastrophe with reference to Bangladesh, পৃ: ৩৪-৩৭।

হিসেবে; আর অন্যদিকে খুব কম মানুষই পাওয়া যাবে যারা এমন এক সমাজে বসবাস করতে চাইবে যে সমাজ পশ্চাৎপদ, যে সমাজে ধর্মভিত্তিক উন্মাদনা ও সাম্প্রদায়িক হানাহানি নিত্যনৈমেত্তিক ব্যাপার, এবং যে সমাজে জীবনের নিরাপত্তা সদা হুমকির মুখে। সম্ভবত এসব কারণেই ফরাসি দার্শনিক জ্যাঁ-জ্যাক রুশো (১৭১২-১৭৭৮) ছোট্ট করে বলেছিলেন, "মানুষের চরিত্র মূলত স্বার্থপর নয়"।

বিশ্বব্যাপী এমুহর্তে মোট ধর্মের সংখ্যা ১০ হাজারের অধিক। যে কোন ধর্মই হোক না কেন প্রত্যেক নির্দিষ্ট ধর্মই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে "সত্য" (Truth) একটিই এবং সেটা ঐ ধর্মেই নিহিত। আর ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসীদের ঘৃণা করা অথবা বিদ্বেষমূলক আচরণ ধর্ম বিশ্বাসেরই অংশ। ১৫০০ সালের দিকে চার্চ-সংস্কারক মার্টিন লুথার ইহুদিদেরকে "জাত সাপের শাবকদল" হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। কয়েক শত বছর ধরে ইহুদিদের উপর খ্রিস্টানদের সংঘবদ্ধ লুণ্ঠন-নির্যাতন-হত্যাকাণ্ড শেষ পর্যন্ত ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের কারণ হয়ে দাড়িয়েছিলো। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠি ১৯৪৭ সালে যখন ভারতবর্ষ ভাগ করে হিন্দুদের জন্য হিন্দুস্থান আর মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিলো তখন কয়েক লক্ষ মানুষ হত্যার শিকার হয়েছিলো। ধর্মে-ধর্মে হানাহানি কখনও কমে নি। ২০০০ সালে থেকে এ পর্যন্ত যত গৃহযুদ্ধ হয়েছে তার ৪৩ শতাংশের মূল কারণটিই ধর্ম-সংশ্লিষ্ট।

পৃথিবীর ৮০০ কোটি মানুষের মধ্যে ৬৪ শতাংশই ইসলাম, খ্রিস্টান ও হিন্দু ধর্মাবলম্বী। "ধর্ম" প্রকৃতিগতভাবেই শক্ত করে আঁকড়ে থাকার মত বিষয়। ২০০৭ সালে গণচীনের ১৬ বছর বা তদুর্ধ বয়সীদের এক-তৃতীয়াংশ বলেছে তারা ধর্মে বিশ্বাস করে (অবশ্য মাও-সে-তুং-এর আমলে ধর্ম নিয়ে এমনটি বলা সম্ভব ছিল না)। মার্কিনিদের ৯৫ শতাংশ বলেছেন তারা সৃষ্টিকর্তা ('God' অর্থে) বিশ্বাস করেন, ৯০ শতাংশ বলেছেন তারা উপাসনা করেন, ৮২ শতাংশ বলেছেন সৃষ্টিকার্তা অসম্ভবকে সম্ভব করতে সক্ষম এবং ৭০ শতাংশ মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করেন। তবে মাত্র ৫০ শতাংশ মার্কিনি বলেছেন যে তারা দোজখে বিশ্বাস করেন– উপরের অন্যান্য তথ্যের সাথে মিলালে এক্ষেত্রে বেশ অসামঞ্জস্য দেখা যায়। ১৯৯৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞানীদের উপরে এক জরিপে দেখা যায় যে তাদের ৩৯ শতাংশ ধর্মে বিশ্বাস করেন (অথচ এক্ষত্রে জাতীয় গড় ৯০ শতাংশ)। আবার মার্কিন বিজ্ঞানিদের মধ্যে যাদের অবস্থান উচ্চস্থানে (অর্থাৎ জরিপের সংজ্ঞানুযায়ী যারা ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্স-এর সদস্য) তাদের মধ্যে মাত্র ৭ শতাংশ সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করেন (অর্থাৎ তাদের ৯৩ শতাংশ বিশ্বাস করেন না), আর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞানীদের প্রায় সবায়ই ধর্মে বিশ্বাসী নন। ব্রিটেনের রয়েল সোসাইটির বিজ্ঞানীদের মাত্র ৩ শতাংশ ধর্ম বিশ্বাসী। আবার ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপরে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-উপশাখার বিজ্ঞানীদের অবস্থা এক নয়: জীববিজ্ঞানীরা পদার্থবিজ্ঞানীদের তুলনায় ধর্ম বিশ্বাস ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন নিয়ে অনেক কম বিশ্বাসী; আর এ কারণেই প্রখ্যাত বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানীদের ৭৮ শতাংশ নিজেদেরকে 'বস্তবাদী' বলে আখ্যায়িত করেন (অর্থাৎ তাদের বিশ্বাস হলো 'বস্তু' অর্থাৎ Physical matter-ই একমাত্র বাস্তব সত্য অন্য কিছু নয়) ; এদের ৭২ শতাংশ মনে করেন ধর্ম হলো এক সামাজিক বিষয় (Social phenomenon) যার আবির্ভাব ঘটেছিল তখন থেকে যখন থেকে মানুষ হোমো স্যাপিয়েন্স হিসেবে বিকাশ লাভ করেছে (অর্থাৎ আজ থেকে ৫-১৫ লক্ষ বছর আগের কথা)। তারা ধর্ম নিয়ে কোন সংঘর্ষে না গিয়ে বলতে চান ধর্ম হলো মানুষের বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফল। একথা যুক্তিসংগত যে ধর্মের বিবর্তনমূলক সুবিধা আছে। ধর্মের প্রতি আকর্ষণ অথবা ধর্ম-বিশ্বাসে নিয়ামক ভূমিকা রাখে অন্তর্জাগতিক বিষয়াদি, ঐশ্বরিক বিষয়াদি, অপার্থিব বিষয়াদি, অতিপ্রাকৃত বিষয়াদি, আধ্যাত্মিক বিষয়াদি (এক কথায় যাকে বলে spirituality)। এবং এসব বিষয়ের ৫০ শতাংশ নির্দ্ধারিত হয় বংশানুগতিসুত্রে (অর্থাৎ genetically determined)। আবার "আধ্যাত্মিকতা" অথবা "অতিপ্রাকৃত বিষয়ে বিশ্বাস" বিষয়টি এমনই যে তা মানতে ধর্ম-বিশ্বাস

বাধ্যতামূলক নয়। কোন একজন ধর্ম বিশ্বাসী হবেন কি হবেন না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি 'মুক্ত' নন (not `free')। যে কোন ব্যাক্তির নির্দিষ্ট ধর্মে বিশ্বাস মূলত জন্মসূত্রীয় বিষয়; জন্মসূত্রেই মাতৃগর্ভে থেকে শুরু করে জন্মের কিছু কালের মধ্যেই তার ব্রেইন সার্কিটে ঐ ধর্ম-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি গেঁথে যায়। বিষয়টি অনেকটা মাতৃভাষার মতো, যেমন বাঙালি মায়ের গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরে কথা বলা শুরু করলে বাংলাভাষায় কথা বলে, অথবা ইংরেজ মায়ের সন্তান ইংরেজিতে কথা বলে বাংলায় নয়। এসব ক্ষেত্রে সেরোটোনিন নামে একধরনের 'রাসায়নিক বাহক' (chemical messenger) নির্দ্ধারণ করে দেয় সেই মাত্রা যে মাত্রায় একজন আধ্যাত্মিক বিষয়ে অথবা অতিপ্রাকৃত বিষয়ে অথবা ঐশ্বরিক বিষয়ে বিশ্বাসী হবেন। বিজ্ঞানীরা বলছেন যে একজন ব্যাক্তির মধ্যে আধ্যাত্মিকতার স্কোর (বা মাত্রা) কতদূর হবে তা নির্ভর করে ঐ ব্যাক্তি মোট কতটি সেরোটোনিন বহন (serotonin receptor) করেছেন তার উপর।

একজন শিশুর জন্মের পরপরই তার ব্রেইনে "ধর্মের প্রোগামিং" এর কাজ শুরু হয়। শিশুর "প্রোগামড্ বিশ্বাস" হলো বিবর্তনের উপজাত (by product of evolution)। একজন শিশু যে কোন বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষার কারণেই তার পিতা-মাতা এবং/অথবা শিশু-রক্ষা প্রতিষ্ঠানের (হতে পারে নার্সারি, প্লেগ্রুপ ইত্যাদি) আদেশ-নির্দেশ কোন যুক্তি ছাড়াই মেনে চলে। যে কারণেই শিশুরা হয় সরল বিশ্বাসী। আর সে কারণেই সহজেই অনুশাসনযোগ্য (indoctrinate অর্থে)। সুতরাং দাঁড়াচ্ছে এরকম: একজন শিশুর ধর্ম বিশ্বাস যে তার পিতা-মাতা থেকে জন্মসুত্রে প্রাপ্ত— বিষয়টি সার্বজনীন; শিশুরা অনুকরণ করে যে সামাজিক শিক্ষা পেয়ে থাকে তা যথেষ্ট মাত্রায় ফলপ্রদ মেকানিজম, আর এসবে আমাদের মস্তিষ্কে কাজ করে আয়না-নিউরন (mirror neuron); এসব বিশ্বাস যে মৃত্যুর পরে জীবন আছে এবং/অথবা ধর্ম যুদ্ধে বা ধর্মপ্রতিষ্ঠা নিয়ে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করলে শহিদ হয়ে বেহেশতবাসী হবেন (এবং সেখানে কল্পনাতীত অনেক কিছুই পাবেন) এবং/অথবা ধর্মে অবিশ্বাসী হলে মহাশাস্তি হবে এবং/অথবা আল্লাহ-ঈশ্বর-ভগবান-এ বিশ্বাসের চেয়ে এ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু থাকতে পারে না— এসবই বংশপরম্পরা চলে আসছে এবং তা আমাদের ব্রেইন সার্কিটে প্রোথিত হয়ে গেঁথে আছে। আমরা সবাই একটা সত্য জানি ও মানি যে শৈশবকালীন বিকাশের ধারা থেকে বেরুনো দুঃসাধ্য ব্যাপার।

আধুনিক মানুষের বিবর্তন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে পাঁচটি আচরণগত বৈশিষ্ট্য দিয়েছে: (১) ভাষা (language), (২) শ্রমের যন্ত্র (tool making), (৩) গান (music), (৪) শিল্পকলা (art), এবং (৫) ধর্ম। ধর্ম ব্যতীত এসব বৈশিষ্ট্যের অগ্রসূচকের সবগুলিই প্রাণিজগতে পাওয়া যাবে। তবে মানব সভ্যতায় ধর্মের বেশ কিছু বিবর্তনমূলক সুবিধে স্পষ্ট এবং অনস্বীকার্য়। যেমন: (১) "ধর্ম" বিভিন্ন গ্রুপকে একত্রিত করে; বিভিন্ন গ্রুপের মানুষের মধ্যে সংহতি সৃষ্টি করে; (২) ধর্মের বিভিন্ন বাণী, আদেশ, নিষেধাজ্ঞার বেশ কিছু সুবিধে আছে; (৩) ধর্ম-বিশ্বাস মানুষকে দুঃসময়ে সহায়তা করে এবং শান্তি দেয়– যেমন একজন চরম অসুস্থ মানুষকে "মানসিক শান্তি" দিতে পারে; এমনকি অনেক ক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীন ও বিচারহীনতার পরিবেশে মেয়ে শিশু ও নারীকে হেজাব-বোরখা পরিয়ে বাহ্যত সুরক্ষিত করে। কিন্তু ধর্মে অবিশ্বাসী যারা দুঃসময়ে তাদের সমস্যার সমাধান কোন ঐশ্বরিক আস্থা-বিশ্বাস ছাড়াই নিজেকেই করতে হয়; (৪) আল্লাহ-ঈশ্বর যেহেতু সবকিছুই জানেন ও বোঝেন সেহেতু তার কাছে সব সমস্যার সমাধান আছে — এ বিশ্বাস ধর্ম বিশ্বাসিদের আশাবাদী করে; (৫) ধর্ম বিশ্বাস মৃত্যু ভয় হ্রাস করে (কারণ সব ধর্মই মৃত্যু পরবর্তী জীবনের কথা বলে); এবং (৬) নিজ ধর্ম সমুন্নত রাখতে অন্য ধর্মের মানুষ হত্যা — প্রায় সব ধর্মেই স্বীকৃত। যে কারণে ধর্মভিত্তিক ঘৃণা-বিদ্বেষ (xenophobia), আন্ত-ধর্ম সংঘাত, অগ্নিসংযোগ আর তরবারি ব্যবহার করে "ঈশ্বরের শান্তি" ("Peace of God")— এসব সহজে বিলীন হবার নয়।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়– অগণিত মানুষকে খ্রিস্টধর্মসহ অন্যান্য ধর্মের দোহাই দিয়ে শাস্তি দেয়া হয়েছে, কারাগারে পাঠানো হয়েছে, হত্যা করা হয়েছে। ওল্ড টেস্টামেন্টে অসংখ্য হত্যা কাহিনী এবং তার ধণাত্মক ফল বর্ণিত আছে। কিন্তু যিশু খ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যার পরে খ্রিস্টানরা ইহুদি নিধনের ধর্মভিত্তিক যুক্তি খুঁজে বের করেছে। আবার শান্তির কথা বলতে গিয়ে এমনও বলা হয়েছে: "আমি এখন শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আসিনি, আমি তরবারি নিয়ে এসেছি" (দেখুন, Mathew 10:34)। এসব কথা থেকে মনে হতে পারে আমি কোনো এক বিশেষ ধর্মকে দোষ দেবার চেষ্টা করেছি। ব্যাপারটি আদৌ তা নয়। প্রায় সব ধর্মেই আছে মৌলবাদ, পশ্চাৎপদ ধ্যান-ধারণা যা'কে যে কোন মূল্যে 'সত্য' (Truth) বলে গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। আবার ধর্মীয় জঙ্গিত্ব-উগ্রবাদ-আগ্রাসন আদৌ কোন নির্দিষ্ট ধর্ম-বিশ্বাসের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। খ্রিস্টান চরমপন্থী-উগ্রবাদী জঙ্গি টিমোথি ম্যাকভেইগ (যাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বলা হয় "Oklahoma City Bomber") ১৬৯ জনকে হত্যা করে; ইসলাম ধর্মের বিন-লাদেন এবং অন্যান্য অনেকে (এ নিয়ে বেশ বিতর্ক আছে) ২০১১ সালের ৯/১১-তে নিউইউর্কের টুইন টাওয়ার ধ্বংস করে। ইসলাম ধর্মসহ অনেক ধর্মেই সুইসাইড বোমারুরা নিরীহ মানুষ হত্য করেছে ও করছে; ছোটখাটো অন্যায়ে হাতের কব্জি কেটে ফেলা, জনসম্মুখে পাথর নিক্ষেপ করা যেখানে প্রথম পাথরটা বিচারকই নিক্ষেপ করেন (ইরানে ২০০৭-এর জুলাই মাসে), ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের হত্যা করা, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রদর্শন করা, মেয়েদের যৌনাঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করা (যা পবিত্র কুরআন শরিফের কোথাও নেই) এবং তথাকথিত ইসলামি পণ্ডিতদের দিয়ে ফতোয়া দেয়া (যেমনটি দিয়েছেন মিসরের পণ্ডিত ইউসুফ আল-বাদরি) যে এর ফলে "নারীরা আরো সংযমি হবেন", "পশ্চিমা দুনিয়ার অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে", "এইচ আইভি ও এইডস জাতীয় রোগ-ব্যাধি নির্মূল হয়ে যাবে"।

এসবের পাশাপাশি আফগানিস্তানে তালেবান, প্যালেস্টাইনে হামাস, লেবাননে হিযবুল্লাহ-দের উগ্রপন্থি জঙ্গি সংগঠনসমূহ বেশ দ্রুতহারে শক্তি সঞ্চয় করছে এবং জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এসব থেকে কোনভাবেই এ উপসংহারে আসা যাবে না যে এসব এককভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে মুসলমানদের সমস্যা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বুশ প্রশাসনের আমলে খ্রিস্টান মৌলবাদীরা সরকারি সমর্থনেই ব্যপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রো-লাইফ ক্যাম্পেইন করেছে, ডারউইন বিরোধী মতবাদ ব্যাপক প্রচার করেছে, এবং একই সময়ে ইহুদি উগ্রপন্থি-মৌলবাদ-জঙ্গিগোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবেই ইসরায়েলসহ বিশ্বের বহুদেশে (ইসরাইলের গোয়েন্দাসংস্থা মোসাদের সহায়তায়) ঘৃণ্যতম-বর্বর ঘটনা ঘটিয়েছে। অর্থ্যাৎ আপাতত দেখা যাচ্ছে যে বিশ্বব্যাপী ধর্মের নামে ধর্মের দোহাই দিয়ে নিরীহ মানুষের জীবনপাত হতেই থাকবে। এটা অসভ্য ও অত্যন্ত লজ্জাসকর এজন্য যে শিশুদের এসবে বাধ্যানুগত করা হচ্ছে। অথচ শিশুদের আধ্যাত্মিক মন-মননকে (spirituality অর্থে) জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প-সংস্কৃতির বহুমুখী শাখা-প্রশাখায় ব্যবহার-প্রয়োগের সুযোগ দিয়ে তাদের সুখী-সমৃদ্ধ প্রগতিবাদী-আলোকিত মানুষ গড়ার পথ সুপ্রশস্ত করা প্রয়োজন এবং তা সম্ভব।

৯. মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের সম্ভাব্য "সীমানা": তাহলে করণীয়?

ইসলাম ধর্মসহ বিভিন্ন ধর্ম প্রচারে ঐতিহাসিকভাবে কোথাও যুদ্ধবিগ্রহ, কোথাও শান্তিপূর্ণ পথ আবার কোথাও এ দু'য়ের মিশ্রিত পথের ভূমিকা জানা আছে। লক্ষণীয় যে যেখানেই যুদ্ধ-তরবারিকে ধর্ম প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে সেখানেই হয় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নয়ত বা যুদ্ধংদেহী রাষ্ট্র পরিচালন পদ্ধতি জেঁকে বসেছে। কিন্তু যেখানেই অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ পথে দীর্ঘকাল ধর্ম প্রচার এগিয়েছে– যেমন আমাদের দেশে ওলি-আওলিয়া-সুফি-সাধকরা (sufism)– সেখানে ধর্মভিত্তিক উগ্র

সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কখনও শক্ত ভিত পায়নি। উল্টো ধর্মগুরুরা যখনই ধর্মকে রাষ্ট্র পরিচালনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারে সচেষ্ট হয়েছেন তখনই বাঁধার সম্মুখীন হয়েছেন। কারণ শান্তিপূর্ণ পথে ধর্ম প্রচার ও ধর্ম পালনের ফলে মানুষ বংশপরম্পরা ধর্মভীরু হয়েছেন কিন্তু বক-ধার্মিক হন'নি। অর্থাৎ ধর্মের মূল ধারণাটি (perception of religion অর্থাৎ religiosity) এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার বিপরীতে বহুলাংশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাহন হয়েছে। আর সে কারণেই মৌলবাদের অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিবাদ এ দেশে যতই শক্তিশালী হোক না কেন, ঐ শক্তি ব্যবহার করে ধর্মের নামে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল সম্ভব হবে না। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি উদাহরণ বেশ প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

(১) এ দেশে শত্রু ও অর্পিত সম্পত্তি আইনে ৫০ লক্ষ হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের যে ২১ লক্ষ একর ভূ-সম্পত্তিসহ অন্যান্য সম্পদ গ্রাস করা হয়েছে তা গ্রাস করেছেন মাত্র ০.৪ শতাংশ মুসলমান (গ্রাসকারীরা সবাই যদি মুসলমান হন)– অর্থাৎ ৯৯.৬ শতাংশ মুসলমান ভিন্ন ধর্মের মানুষের সম্পদ জোরদখলের সাথে সম্পৃক্ত নন– (অনেকেই এটা হিন্দু-বনাম মুসলমান সমীকরণে রূপান্তরের অপপ্রয়াস চালান)।

(২) বাগমারায় উগ্র-জঙ্গি মৌলবাদ– বাংলাভাইকে– রাষ্ট্রযন্ত্র যতই মদত দিক না কেন– এলাকার মানুষই কিন্তু জোটবদ্ধভাবে তা মোকাবেলা করেছে– মূল ধর্ম-গোষ্ঠীর অসাম্প্রদায়িক সুপ্ত চেতনার এ-এক স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ।

(৩) ১৯৮৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাদ ভেঙ্গে পড়ার পরে ঢাকা মেডিকেলসহ অন্যান্য হাসপাতালে হিন্দু ধর্মাবলম্বী আহত ছাত্রদের জীবন বাঁচাতে রক্ত দানে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সবাই যেভাবে এগিয়ে এসেছিলেন– তা নিশ্চয়ই অসাম্প্রদায়িক চেতনার অপার শক্তিকেই নির্দেশ করে।

(৪) ২০১২ সালে (২৭-২৮ সেপ্টেম্বর) কক্সবাজারের রামুতে জামাত-জঙ্গিরা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর যে পরিকল্পিত ধ্বংসযজ্ঞ করলো সেখানে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মানুষ যেভাবে এগিয়ে আসলো তা কি এ দেশের সাধারণ মানুষের অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ নয়?

(৫) ২০১৩-র ফেব্রুয়ারি থেকে শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে তরুণ প্রজন্ম ধর্মীয় মৌলবাদ বিরোধী যে দৃঢ়চেতা অবস্থান নিলো এবং যে অবস্থান চলমান তা'কি যথেষ্ট প্রমাণ নয় যে এ দেশের তরুণ সমাজ মুক্তি-স্বাধীনতার চেতনার সবকিছু পূর্ণাঙ্গ ধারণ করে?

(৬) ইসলাম ধর্মের পজিটিভ ডিএনএ-র বাহক এ দেশের এক জন সাধারণ মুসলমানও কি সুইসাইড বোমাবাজদের কর্মকাণ্ড সমর্থন করেন? না কি প্রায় সকলেই মনে করেন যে এসবই ধর্মের নামে গভীর ষড়যন্ত্রমূলক অধর্মের কাজ?

এত কিছুর পরেও, "আত্মতুষ্ট হয়ে বসে থাকলে বিপদ নেই"– এমনটি ভাববার যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ নেই। কারণ বিষয়টি গভীরভাবে রাজনৈতিক– ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য প্রাগ্রসর পরিবেশ সৃষ্টির। অতএব লড়াইটিও রাজনৈতিক। মৌলবাদের অর্থনৈতিক ভিত এবং সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্ব যে পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করেছে ও করছে তাতে লড়াইটা হতে হবে সর্বব্যাপী বহুমাত্রিক ও বহুকেন্দ্রিক। এ লড়াইয়ে অনগ্রসর মানস-কাঠামোর বিরুদ্ধে প্রগতির লড়াই; আর সুফি-সাধক-ওলামাদের জন্য মানবতাবিরোধী সাম্প্রদায়িকতার

বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্মের উদারনৈতিক মানবতাবাদী ধারা পুনঃস্থাপনের লড়াই। সুতরাং এ লড়াইয়ে একদিকে ইসলাম ধর্মের উগ্র সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ ধারার মোকাবেলায় মাবকল্যাণকামী সুফি-উলামা ধারার প্রবক্তাদের– যারা ঐতিহাসিকভাবেই মূল ধারার প্রবক্তা– মানবকল্যাণে সংঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন আর অন্যদিকে অসাম্প্রদায়িক চেতনার লালন এবং মুক্ত চিন্তা ও স্বাধীনতার ভিত্তি প্রসার নিমিত্ত জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাই হতে পারে অনাকাঙ্খিত মৌলবাদী অর্থনীতির ভিত্তিমূল দুর্বল করার একমাত্র পথ।

মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতির বিকাশমান ভিত্তিতে আমাদের দেশে ধর্মভিত্তিক মৌলবাদী জঙ্গিত্ব আস্তে আস্তে যে রূপ ধারণ করেছে তা থেকে আমি অন্তত নিশ্চিত যে "*এ মুহূর্তে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে*"– এমনটি ভাবলে বাস্তব সত্য অস্বীকার করা হবে; এমনটি ভাবলে অস্বীকার করা হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ অথচ এখনও পর্যন্ত স্বল্পগবেষিত "ধর্মীয় মন-মস্তিষ্ক-স্নায়ুতন্ত্রের" বিজ্ঞানকে (গুরুত্বের কারণে বিষয়টি অষ্টম পরিচ্ছেদে বিষদ বিশ্লেষিত হয়েছে)। আর এসব অগ্রাহ্য করলে তা হতে পারে উচ্ছ্বাস উদ্ভূত ঐতিহাসিক বিভ্রান্তিরও কারণ। সুতরাং মহাবিপর্যয় রোধে আশু (স্বল্প মেয়াদি) ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের পথ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক জঙ্গিত্ব এখনই নির্মূল সম্ভব নয় কারণ যেসব জটিল ভিত্তির ওপর সে দাঁড়িয়ে আছে তা কয়েকদিনে ভেঙ্গে ফেলা যাবে না। আর ভিত্তিটি নিঃসন্দেহে দেশের ভিতরের (internal factors) দারিদ্র্য-দুর্দশা-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা ও ধর্মীয় মন-মস্তিষ্ক-স্নায়ুতন্ত্রসহ বহিঃস্থ উপাদান (external factors) সংশ্লিষ্ট। বাস্তবে যা সম্ভব তা হলো একই সাথে "*ক্ষতি হ্রাসের কৌশল*" (damage minimizing strategy) ও "ঝুঁকি হ্রাসের কৌশল" (risk reduction strategy)[৩৬] দ্রুত বাস্তবায়ন করা। স্বল্প মেয়াদি সমাধান হিসেবে "ক্ষতি হ্রাস কৌশল" ও "ঝুঁকি হ্রাস কৌশল" (যা সমস্যার স্থায়ী সমাধান নয়) হতে পারে একই সাথে কয়েকটি কাজ করা:

(১) ১৯৭১-এ যারা মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধ করেছেন– যারাই মৌলবাদী জঙ্গিদের গডফাদার– তাদের বিচার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে শাস্তি কার্যকর করা (সম্ভব হলে আগামী ৫ বছরের মধ্যে)[৩৭]।

(২) জঙ্গিদের অর্থায়নের উৎস সম্পর্কে সরকারের যা কিছু জানা আছে তা অতি দ্রুত গণমাধ্যমে প্রকাশ-প্রচার করা।

(৩) জঙ্গি অর্থায়নের উৎসমুখ বন্ধ করা।

(৪) মৌলবাদের অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট (শিল্প, সংস্কৃতি, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশনসহ) প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের তৃতীয়-পক্ষীয় অডিটের মাধ্যমে জামাত-জঙ্গি সংশ্লিষ্টতা উদঘাটন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে জাতীয়করণ, বাজেয়াপ্তকরণ, আইনি হস্তান্তর, ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন, পর্ষদ পরিবর্তন ইত্যাদি।

(৫) জঙ্গিদের অস্ত্রের উৎস সম্পর্কে সরকারের যা কিছু জানা আছে তা অতি দ্রুত গণমাধ্যমে প্রচার করা।

---

৩৬ এ বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, আবুল বারকাত, ২০১৫, A Political Economy Treatise on Religious Fundamentalism and Extremism: A high probability global catastrophy with reference to Bangladesh, পৃঃ ২৭-৩৭।

৩৭ মনে রাখা জরুরি যে ধনতান্ত্রিক কাঠামোতে rent-seeker-রা সম্পদ সৃষ্টি করে না, সম্পদ হ্রাস করে এবং ধ্বংস করে। আর একই কাঠামোতে যখন ধর্মভিত্তিক জঙ্গি rent-seeker আবির্ভূত হয় তখন সম্ভাব্য ক্ষতি-ধ্বংস মাত্রা এবং ঝুঁকি মাত্রা এখনকার তুলনায় অনেক গুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। এসবের অনেক উদাহরণ এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দৃশ্যমান।

(৬) জঙ্গিদের সংশ্লিষ্ট সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা।

(৭) বাজেয়াপ্তকৃত এ সম্পদ সরকারের তত্ত্বাবধানে এনে ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন, পঙ্গুত্ববরণ করেছেন, অসচ্ছল জীবন-যাপন করছেন এবং পরবর্তীকালে যারা মৌলবাদী জঙ্গিত্বের কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং পঙ্গুত্ববরণসহ আহত হয়েছেন– ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাদের দেয়া, সেইসাথে সামাজিক-সাংস্কৃতিক মানব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তা ব্যয় করা।

(৮) জঙ্গি কর্মকাণ্ডের সাথে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে জড়িত সবাইকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া।

(৯) জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ বিরোধী গোয়েন্দা নজরদারি সিস্টেম অনেক বেশি তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর ও দ্রুত ফলপ্রদ ও কার্যকর করার জন্য সমন্বিত কার্যক্রম জোরদার করা।

(১০) সরকারের জঙ্গিদমন ও ধৃত জঙ্গিদের মধ্যে জঙ্গি-বিরোধী সচেতনতা-সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি (deradicalisation programme) ফলপ্রদতার সাথে পরিচালন করা।

(১১) জঙ্গিদের অস্ত্রের উৎসমুখ বন্ধ করা এবং একই সাথে অস্ত্র উদ্ধারে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(১২) রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যেই যারা জঙ্গিত্ব-প্রমোটার তাদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেয়া এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সরকার থেকে তাদের বহিষ্কার করা।

(১৩) ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার আন্দোলন-সংগ্রাম জোরদার করা।

(১৪) ধর্মীয় জঙ্গিদের প্রকৃত চেহারা-লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উন্মোচনে গণসচেতনতা বৃদ্ধি-সহায়ক সিরিয়াস প্রচারণামূলক কর্মকাণ্ড করা যাতে জনগণই জঙ্গি নির্মূল প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন। গণসচেতনতা বৃদ্ধির প্রচারণামূলক এই কর্মকাণ্ডে সব ধরনের পথ-পদ্ধতি-মাধ্যম ব্যবহার করা প্রয়োজন। তবে সঙ্গত কারণে জুম্মার নামাজ হয় এমন মসজিদে জুম্মার খুতবার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। কারণ ১৬ কোটি মানুষের বাংলাদেশে মোট ২,৬৪,৯৪০টি জুম্মা-মসজিদে গড়ে প্রতি সপ্তাহে জুম্মার নামাজে অংশগ্রহণ করেন ২ কোটি ৬৪ লক্ষ মুসল্লি যারা আবার বাড়িতে ফিরে মোট ১০ কোটি ৪৪ লক্ষ ব্যক্তির সাথে কথাবার্তা বলেন।[৩৮]

(১৫) সমগ্র শিক্ষা-সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য সেবাপ্রদান কর্মসূচিকে দেশের সংবিধানের মূল চেতনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংস্কার সাধন ও তা বাস্তবায়ন করা।

আশু ও স্বল্পমেয়াদি উল্লিখিত কার্যক্রমে একদিকে যেমন রাষ্ট্র ও সরকারকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে অন্যদিকে দেশের গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত নারী-পুরুষ-জাতি-ধর্ম-বর্ণ-পেশা নির্বিশেষে সকল

[৩৮] বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, ২০১৫, A Political Economy Treatise on Religious Fundamentalism and Extremism: A high probability global catastrophe with reference to Bangladesh. Lead Speakers Paper for the workshop *"Counterina Religious Extremism in South Asia"* IISS, London, United Kingdom. 09 September 2015.

অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ সুসংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এবং এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে তরুণ প্রজন্মকে আর একইসাথে শিশু-কিশোরদের অসাম্প্রদায়িক মন-মনন-মানসিকতা বিনির্মাণে জ্ঞান-বিজ্ঞানভিত্তিক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

উপরে যা উল্লেখ করেছি সেসব হল সাম্প্রদায়িক জঙ্গিত্ব রোধে আশু বা স্বল্প মেয়াদের "ক্ষতি হ্রাস কৌশল" ও "ঝুঁকি হ্রাস কৌশল" মাত্র, স্বল্প মেয়াদি এসব অবলম্বনে সমাধানও হবে কার্যত স্বল্পমেয়াদি, সুতরাং ভাবতে হবে দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের কথা। আমার বিবেচনায় দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হতে পারে মাত্র একটি— তা হ'ল দেশে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বৈষম্য বিলোপসহ অসাম্প্রদায়িক মানস কাঠামো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা। স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি উভয় লক্ষ্য বাস্তবায়নে অসাম্প্রদায়িক সকল মানুষের সচেতন ঐক্যের কোনোই বিকল্প নেই।

মৌলবাদী অর্থনীতি, উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও সংশ্লিষ্ট মৌলবাদী জঙ্গিত্ব— এসবই পশ্চাৎপদ। সুতরাং পশ্চাৎপদতা অপসারণ ও প্রগতি নিশ্চিতকরণে উল্লিখিত কর্মপ্রণালিদ্বয়ের ভিত্তিতে ব্যাপক জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার কোনো বিকল্প নেই। ধর্মান্ধ উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জনগণের সুদৃঢ় এ ঐক্যের ভিত্তিতে যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে নিচ্ছিদ্রভাবে সে শর্ত সৃষ্টি করতে হবে যখন এদেশে আর কেউ যেন জন্মসূত্রে দরিদ্র না হতে পারে। আর সে লক্ষ্যে মুক্তি সংগ্রামে অর্জিত জনগণের আকাঙ্ক্ষার সর্বোচ্চ আইন ১৯৭২-এর মূল সংবিধানে প্রস্তাবনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের অংঙ্গিকার *"আমরা অংঙ্গিকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহিদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল— জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূল নীতি হইবে"* (১৯৭২ এর মূল সংবিধান, প্রস্তাবনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ), এবং মূল সংবিধানের দশম অনুচ্ছেদ (যা বঙ্গবন্ধু হত্যাপরবর্তী অবৈধ জিয়া সরকার ১৯৭৮-এ বাতিল ঘোষণা করেন) যেখানে জনগণের সুস্পষ্ট রায় বিধৃত ছিল এভাবে যে, *"মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে"*— সংবিধানে বিধৃত এসব গণ-অঙ্গীকার ও গণরায় সম্পূর্ণ সচেতনভাবে এবং অখণ্ডিতভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে। এসবের ভিত্তিতেই বাস্তবায়ন করতে হবে সংবিধানের জনকল্যাণকামী মূল বিধানসমূহ যার মধ্যে আছে মানুষের সমমর্যাদা, সব মানুষের সমসুযোগের অধিকার, কাজ পাবার অধিকার, বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা পাবার অধিকার এবং স্বাস্থ্যসেবা পাবার অধিকার ইত্যাদি। মানুষের স্বাভাবিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী এসব সুযোগের অভাবই সে হতাশা-নিরাশা সৃষ্টি করে যার উপরই ভর করে ধর্মান্ধ উগ্র সাম্প্রদায়িকতা। দেশে ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি যে মাত্রা নিয়েছে তাতে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে সংকট নিরসনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও কালক্ষেপণ মহাবিপর্যয়ের কারণ হতে পারে।

এ প্রবন্ধে আমি ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিত্বের যে বিচার-বিশ্লেষণ হাজির করেছি তা থেকে যে-কেউই যদি এ ধরনের কোনো উপসংহারে উপনীত হন যে "তাহলে তো আমাদের আরও একবার মুক্তির যুদ্ধ করতে হবে"— সেক্ষেত্রে এ উপসংহার নিয়ে আমিসহ সম্ভবত এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ খুব একটা দ্বিমত পোষণ করবেন না। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে আমরা চেয়েছিলাম, আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম— 'জয় বাংলা' চেতনায় সিক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলা, যে বাংলায় বিনির্মিত হবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শোষণহীন-বঞ্চনাহীন-অসমতামুক্ত বৈষম্যহীন এক রাষ্ট্রব্যবস্থা; যে বাংলায় সৃষ্টি হবে অসাম্প্রদায়িক মানস কাঠামোর বিজ্ঞানমনস্ক

আলোকিত মানুষের সমৃদ্ধ সমাজ; যে বাংলায় ধর্ম হবে যার যার রাষ্ট্র হবে সবার— এবং এ বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায় ১৯৭২-এর সংবিধানের চার মূল স্তম্ভ– জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা— হবে আমাদের প্রগতির প্রধান দর্শনগত ভিত্তি। কিন্তু, স্বাধীনতার ৪৪ বছর পেরিয়ে গেলো— এসব তো হলো না। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো। আর তারই প্রতিফল হিসেবে ফুলে ফেঁপে উঠলো রেন্ট-সিকার নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির দুর্বৃত্তায়ন, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিবাদ, বিচারহীনতার সংস্কৃতি আর একই সাথে ব্যাপক জনমানুষের ক্রমবর্ধমান বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা। এসব কিছুই আমাদের সুদীর্ঘ মুক্তি সংগ্রামের এবং একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থি, ঐ চেতনার সাথে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী, সম্পূর্ণ উল্টো, পূর্ণমাত্রায় সাংঘর্ষিক। তাই আমাদের দেশের জনগণের বিবেচনার জন্য একটি আহবান আসুন সবাই মিলে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের 'জয় বাংলা' চেতনায় আরো একবার ভাবি আর ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে যা করা যুক্তিসংগত সে পথে সক্রিয় অংশগ্রহণ করি।

আর একই সাথে বলা দরকার যে ধর্মের নামে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল মৌলবাদী জঙ্গিত্বের শেষ কথা নয়; বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চিরস্থায়ীকরণই সম্ভবত চূড়ান্ত লক্ষ্য। বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার "হোতা" মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্য হলো পৃথিবীর চারটি মৌল-কৌশলিক সম্পদ–জমি সম্পদ, পানি সম্পদ, তেল-গ্যাস-জ্বালানি-খনিজ সম্পদ, আকাশ-মহাকাশ সম্পদ–এ তাদের নিরঙ্কুশ মালিকানা ও একচ্ছত্র কতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। আর এই চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছানোর বিভিন্ন পথ-পদ্ধতি-পন্থার অন্যতম হলো ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্বকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া (স্থান-কাল-পাত্রভেদে তা যে-কোনো ধর্মই হতে পারে)। সুতরাং যেহেতু "অর্থনৈতিক শোষণ" আর "বৈশ্বিক রেন্ট সিকিং ব্যবস্থা" সবধরনের বিচ্ছিন্নতা (alienation) ও ক্রমবর্ধমান অসমতা (inequality) সৃষ্টির উৎস যা সবধরণের মৌলবাদ (ধর্মভিত্তিক, বর্ণভিত্তিক, জাতিগোষ্ঠিভিত্তিক ইত্যাদি) সৃষ্টি ও পুন:সৃষ্টির ক্ষেত্র উর্বরতর করে, এবং যেহেতু ঐ শোষণ ব্যবস্থা বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য ও প্রভুত্ব-এর অস্তিত্ব ও সম্প্রসারণের প্রধান শর্ত সেহেতু মানবপ্রগতি বিরুদ্ধ এ লড়াই হতে হবে সর্বব্যাপ্ত–একই সাথে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং মৌলবাদ বিরোধী। এ কর্মযজ্ঞটি সৃজনশীল। এ কর্মযজ্ঞ একক কোন দেশে সফল হবার নয়। তাই শুধু বাংলাদেশের জনগণই নয় সমগ্র বিশ্বের শোষিত, নিগৃহিত, বিচ্ছিন্নতার শিকার, বঞ্চিত সবার কাছে আহবান–আসুন সাম্রাজ্যবাদ ও মৌলবাদ বিরোধী লড়াই-এর এই সৃজনশীল কর্মযজ্ঞে শামিল হই এবং বিনির্মান করি শোষণমুক্ত-বঞ্চনামুক্ত-অসাম্প্রদায়িক আলোকিত মানুষের পৃথিবী। এ কর্মযজ্ঞে দ্বিধাদ্বন্ধ ও কালক্ষেপণ মহাবিপর্যয়ের কারণ হতে পারে– শুধু বাংলাদেশেই নয় সমগ্র বিশ্বে।

পরিশিষ্ট ১: বাংলাদেশে জঙ্গি কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট অথবা জঙ্গিবাদ সমর্থনকারী ইসলামি সংস্থাসমূহের নাম (সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত ও কালো তালিকাভুক্তসহ)

১. আফগান পরিষদ
২. আহলে হাদিস আন্দোলন
৩. আহলে হাদিস যুব সংঘ (এএইচজেএস)
৪. আহলে হাদিস তবলিগা ইসলাম
৫. আহসাব বাহিনী (আত্মঘাতি সুইসাইড গ্রুপ)
৬. আল হারামাইয়েন (এনজিও)
৭. আল হারাত আল ইসলামিয়া
৮. আল ইসলাম মারর্টারস ব্রিগেড
৯. আল ইসলামী সংঘতি পরিষদ
১০. আল জাজিরা
১১. আল জিহাদ বাংলাদেশ
১২. আল খিদমত
১৩. আল কুরত আল ইসলামী মারর্টারস
১৪. আল মারকাজুল আল ইসলামী
১৫. আল মুজাহীদ
১৬. আল কায়দা
১৭. আল সাঈদ মুজাহিদ বাহিনী
১৮. আল তানজীব
১৯. আল উম্মাহ
২০. আল্লার দল *(সরকারিভাবে কালো তালিকাভুক্ত)*
২১. আল্লার দল ব্রিগেড (আত্মঘাতী দল)
২২. আল ইয়াম্মা পরিষদ
২৩. আমানাতুল ফারকান আল খাইরিয়া
২৪. আমিরাত- ই- দিন
২৫. আমরা ঢাকাবাসী
২৬. আনজুমানে তালামজিয়া ইসলামীয়া
২৭. আনসার-আল-ইসলাম
২৮. আনসারুল্লাহ মুসলামিন
২৯. আনসারুল্লাহ বাংলা টিম (এবিটি) *(২০০৫ সালে সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত)*

৩০. আরাকান আর্মি (এ এ)
৩১. আরাকান লিবারেশন ফ্রন্ট (এএলপি)
৩২. আরাকান লিবারেশন পার্টি
৩৩. আরাকান মুজাহিদ পার্টি
৩৪. আরাকান পিপুলস আর্মি
৩৫. আরাকান রোহিঙ্গা ফোর্স
৩৬. আরাকান রোহিঙ্গা ইসলামীক ফ্রন্ট
৩৭. আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (এআর এন ও)
৩৮. ইউনাইটেড স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন অব আরকান মুভমেন্ট
৩৯. ইবতেদাদুল-আল মুসলিমা
৪০. ইকতেদুল তালাহ-আল মুসলেমিন
৪১. ইকতেদুল তুলাহ-আল-মুসলেমিন (আইটিএম)
৪২. ইন্টারন্যাশনাল খাতমে নব্যুয়ত মুভমেন্ট
৪৩. ইসলাহুল মুসলেমিন
৪৪. ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ
৪৫. ইসলামী জিহাদ গ্রুপ
৪৬. ইসলামী লিবারেশন টাইগার অব বাংলাদেশ (আইএলটিবি)
৪৭. ইসলামী প্রচার মিডিয়া
৪৮. ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন
৪৯. ইসলামী সমাজ *(সরকারিভাবে কালো তালিকাভুক্ত)*
৫০. ইসলামিক ডেমোক্রাটিক পার্টি *(সরকারিভাবে কালো তালিকাভুক্ত)*
৫১. ইসলামিক সলিডারিটি ফ্রন্ট
৫২. ইয়ং মুসলিম
৫৩. এবতেদাতুল আল মুসলামিন
৫৪. এহসাব বাহিনী
৫৫. ওয়ারেট ইসলামীক ফ্রন্ট
৫৬. ওয়ার্ড ইসলামীক ফ্রন্ট ফর জিহাদ
৫৭. ওলামা আঞ্জুমান আল বাইয়্যানাত *(সরকারিভাবে কালো তালিকাভুক্ত)*
৫৮. কালেমায়ে-জামাত
৫৯. কালেমা-ই-দাওয়াত (অধ্যাপক আবদুল মজিদ এ দলের প্রধান)
৬০. কতল বাহিনী (আত্মঘাতী গ্রুপ)

৬১. খাতেমী নব্যুয়াত আন্দোলন পরিষদ বাংলাদেশ (কেএনএপিবি)

৬২. খাতেমী নব্যুয়াত কমিটি বাংলাদেশ

৬৩. খিদমত-ই-ইসলাম

৬৪. খিলাফত মজলিশ

৬৫. খিতল-ফি-সাবিলিল্লাহ

৬৬. খিলাফত-ই- হুক্‌মত

৬৭. ছাত্র জামায়েত

৬৮. জাদিদ-আল-কায়েদ

৬৯. জাগ্রত মুসলিম বাংলা

৭০. জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি) *(২০০৫ সালে সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত)*

৭১. জামাত-এশ-সাদাত

৭২. জামায়াত-উল-ইসলাম মুজাহিদ

৭৩. জামাহ-তুল-মুজাহেদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) *(২০০৫ সালে সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত)*

৭৪. জামাত-ই-মুদারাসিন বাংলাদেশ

৭৫. জামাত-ই-তুলবা

৭৬. জামাত-ই-ইয়াহিয়া

৭৭. জামাত-উল-ফালিয়া

৭৮. জামাতুল ইসলাম মুজাহিদ

৭৯. জামাতে আহলে হাদিস

৮০. জামেয়া মোহাম্মদিয়া আরাবিয়া

৮১. জামিয়াতি ইসলামী সলিডারিটি ফ্রন্ট

৮২. জামিয়াতুল ইয়াহিয়া উত তুরাজ

৮৩. জঙ্গি হিকমত

৮৪. জয়শে-মুস্তাফা

৮৫. জয়শে-মোহাম্মদ

৮৬. জামাতুল-আল-শাদাত

৮৭. ডেমোক্রেটিক পার্টি অব আরাকান

৮৮. ন্যাশনাল ইউনাইটেড পার্টি অব আবকান (এনইউপিএ)

৮৯. নিজামায়ে ইসলামী পার্টি

৯০. ফার ইস্ট ইসলামী

৯১. তা আমির-উল-দীন বাংলাদেশ *(সরকারিভাবে কালো তালিকাভুক্ত)*
৯২. তাহফিজ হারমাইন
৯৩. তামির উদ্দিন বাংলাদেশ
৯৪. তানজিম বাংলাদেশ
৯৫. তানজিন-ই-খাতেমি নব্যুয়ত
৯৬. তাওহিদী জনতা
৯৭. তাওহিদ ট্রাস্ট *(সরকারিভাবে কালো তালিকাভুক্ত)*
৯৮. দাওয়াত- ই- ইসলাম
৯৯. বাংলাদেশ ইসলাম রক্ষা কমিটি
১০০. বাংলাদেশ জামায়াত-উল-তালাবা-ই-আরাবিয়া
১০১. বাংলাদেশ সন্ত্রাস বিরোধী দল
১০২. বিশ্ব ইসলামী ফ্রন্ট
১০৩. মজলিশ ই তাফিজা খাতেমি নব্যুয়ত
১০৪. মুজাহিদ অব বাংলাদেশ
১০৫. মুজাহিদী তোয়াবা
১০৬. মুসলিম লিবারেশন ফ্রন্ট অব বার্মা
১০৭. মুসলিম মিল্লাত শরীয়াহ কাউন্সিল
১০৮. মুসলিম মুজাহিদীন বাংলাদেশ (এমএমবি)
১০৯. মুসলিম রক্ষা মুজহাদিল
১১০. রোহিঙ্গা ইনডিপেন্ডেস ফোর্স
১১১. রোহিঙ্গা ইসলামী ফ্রন্ট
১১২. রোহিঙ্গা প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট
১১৩. রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন
১১৪. রিভাইভাল অব ইসলামী হেরিটেজ (এনজিও)
১১৫. লিবারেশন মিয়ানমার ফোর্স
১১৬. লুজমা মককা আল খায়েরা
১১৭. শাহাদাত-ই-আল হিকমা *(২০০৩ সালে সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত)*
১১৮. শাহাদাত-ই-নব্যুয়াত
১১৯. শহীদ নাসিরুল্লাহ খান আরাফাত বিগ্রেড (আত্মঘাতী গ্রুপ)
১২০. সত্যবাদ
১২১. সাহাবা সৈনিক

১২২. হরকত-ই- ইসলাম আল জিহাদ

১২৩. হরকাত-উল জিহাদ-আল-ইসলামী বাংলাদেশ (হুজি) *(২০০৫ সালে সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত)*

১২৪. হায়েতুল ইগাসা

১২৫. হেফাজেতে খাতেমী নব্যুয়ত

১২৬. হিজব-উত-তাহিরির *(২০০৯ সালে সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত)*

১২৭. হিজবা আবু ওমর

১২৮. হিজবুল মাহাদী

১২৯. হিজবুল্লাহ আদেলী বাংলাদেশ

১৩০. হিজবুল্লাহ ইসলামী সমাজ

১৩১. হিজবুত-তাওহিদ

১৩২. হিকমত-উল-জিহাদ

উৎস: আবুল বারকাত, ২০০৭, "Islamic Militants in Bangladesh: An Analysis on the basis of 30 Case Studies", in Berger MS and A Barkat (2007), Radical Islam and Development AID in Bangladesh, Netherlands Institute for International Relations "Clingendael"; আবুল বারকাত, ২০১৫, A Political Economy Treatise on Religious Fundamentalism and Extremism: A high probability global catastrophe with reference to Bangladesh. Lead Speaker's Paper for the workshop *"Countering Religious Extremism in South Asia"* IISS, London, United Kingdom: 09 September 2015.

তথ্য উৎস

আহমেদ, সিরাজ উদদীন, (২০১১). *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

AHMAD, Hazrat Mirza Tahir. (1989). *Murder in the Name of* Allah (translated by Syed Barkat Ahmad). London: Lutterworth Press. (Author wrote in Chapter 5: The Moududian Law of Apostasy, "Maulana Maududi's desire for political power knew no bounds. The law of apostasy which he evolved was an extension of his distatorial and intolerant personality – it had nothing to do with Islam. Ahmed quoting Maududi work: "In our domain we neither allow any Muslim to change his religion nor allow any other religion to propagate its faith", see p. 49).

বারকাত, আবুল, (২০১৬), "মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি বিচার-প্রসঙ্গে", বাঙলার পাঠশালা আয়োজিত দক্ষিণ-এশিয়ায় মৌলবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও নারী-প্রতিরোধ শীর্ষক তৃতীয় দক্ষিণ এশীয় সম্মেলন ২০১৬-এর জন্য রচিত মূল প্রবন্ধ, ঢাকা: ১১-১২ মার্চ ২০১৬।

বারকাত, আবুল, (২০১৫). "বিচারহীনতার সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের উত্থান, স্বরূপ, বিস্তৃতি ও কার্যকারণ সম্পর্ক: সমাধানে সংস্কার নয় প্রয়োজন আমূল পরিবর্তন", বিভাগীয় সেমিনার ২০১৫, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, রংপুর (২৪ অক্টোবর ২০১৫)।

বারকাত, আবুল, (২০১৫). "বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি ও জঙ্গিবাদ: মর্মার্থ ও করণীয়", জাতীয় সেমিনার ২০১৫, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ঢাকা: (১২ ডিসেম্বর ২০১৫)।

বারকাত, আবুল, (২০১৫). "Imperialism and Religious Fundamentalism: A Treatise on Political Economy with reference to Bangladesh", Keynote Paper of International Seminar on "Combating Fandamentalism and Imperialism in Soth Asia", organized by Workers Party of Bangladesh, Dhaka: 29 May 2015.

বারকাত, আবুল, (২০১৫). A Political Economy Treatise on Religious Fundamentalism and Extremism: A high probability global catastrophe with reference to Bangladesh. Lead Speakers Paper for the workshop *"Counterina Religious Extremism in South Asia"* IISS, London, United Kingdom. 09 September 2015.

বারকাত, আবুল, (২০১৫). বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ, বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' কোথায় পৌঁছতো বাংলাদেশ? সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব-প্রভুত্বের যুগে সমতাবাদী সমাজবিনির্মাণের সম্ভাব্যতা প্রসঙ্গে, ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, পৃ: ১৮৩-২১২।

BARKAT, A. (2015). "Imperialism and Religious Fundamentalism: A Treatise on Political Economy with reference to Bangladesh", keynote paper presented at International Seminar titled "Combating Fundamentalism and Imperialism in South Asia" organized by Workers Party of Bangladesh, Dhaka: 29 May 2015.

বারকাত, আবুল, (২০১৪). "*বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে*।" বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত লোকবক্তৃতা ২২ মার্চ ২০১৪। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।

বারকাত, আবুল, (২০১৩). "বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ।" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নবাব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন-এ বাংলাদেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি আয়োজিত "*বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*" শীর্ষক একাডেমিক কনফারেন্স ২০১৩-এর জন্য রচিত মূল প্রবন্ধ, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৩।

BARKAT, A. (2013). "*Economic power base of Islamic fundamentalists in Bangladesh: Formation, EVolution, and Strength",* Presented at Round Table Conference on *Bangladesh: Prospects of Democratic Consolidation*, and Organized by The Society for Policy Studies, India International Centre, New Delhi,07 November 2013.

বারকাত,আবুল, (২০১৩). "বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতি।" বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী আয়োজিত "ধর্ম ও রাজনীতি: দক্ষিণ এশিয়া" শীর্ষক আন্তর্জাতিক গণবক্তৃতা ও সম্মিলন উপলক্ষে রচিত। বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী, স্যুভেনির, পৃ. ৫৭-৮৬, ঢাকা: ৪-৫ অক্টোবর ২০১৩।

BARKAT, A. (2013). "Political Economy of Fundamentalism in Bangladesh". Presented at the International Public Lecture Series and Conference on *Religion and Politics: South Asia* Organized by Bangladesh Itihas Sammilani, Souvenir, pp. 57-86, Dhaka: 4-5 October 2013.

BARKAT, A. (2013). "Political Economy of Fundamentalism in Bangladesh". In *Mainstream*, Special Supplement on Bangladesh. New Delhi: Vol. Ll, No 14, March 13, 2013.

বারকাত, আবুল, (২০১৩). "বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৌলবাদ ও মনোদারিদ্র্য।" আহসান, এম., সরকার, এম ও কবির, বিলু (সম্পাদিত), *গদ্যমঙ্গল*, কুষ্টিয়া: সাহিত্য একাডেমি, পৃ. ২২-৩০.

বারকাত, আবুল, (২০১২). "*নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু: জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সুযোগ*।" বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত "নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু" শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ। ঢাকা: জুলাই ১৯, ২০১২।

বারকাত, আবুল, (২০১২). "*বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতি*।" জাহানারা ইমাম স্মারক বক্তৃতা ২৬ জুন ২০১২। ঢাকা।

BARKAT, A., R. ARA, M. TAHERUDDIN, F.M. ZAHID, and M. BADIUZZAMAN. (2011). *Political Economy of Madrassa Education in Bangladesh: Genesis, Growth, and Impact.* Dhaka: Ramon Publishers.

BARKAT, A. et al. (2007). "*Islamic Militants in Bangladesh: An Analisis on the Basis of 30 Case Studies".* In: Radical Islam and Development AID in Bangladesh. Preliminary Research Study: Islamic activism with case of islamic militancy. Chapter 3, pp. 23-31. Netherlands Institute for International Relations 'Clingendael'. Netherlands: September 2007.

BARKAT, A. (2007). "Islamic Militants in Bangladesh: An Analysis on the basis of 30 Case Studies", in Berger MS and A Barkat (2007), Radical Islam and Development AID in Bangladesh, Netherlands Institute for International Relations "Clingendael";

বারকাত, আবুল, (২০০৭). "Islamic Militants in Bangladesh: An Analysis on the basis of 30 Case Studies", in Berger MS and A Barkat" (2007), Radical Islam and Development AID in Bangladesh, Netherlands Institute for International Relations, "Clingendael")।

বারকাত, আবুল, (২০০৬). "মৌলবাদী অর্থনীতির জঙ্গিত্বের বছর-২০০৫।" *দৈনিক জনকণ্ঠ*, নববর্ষ, ২০০৬।

বারকাত, আবুল, (২০০৬). "*একজন অদরিদ্রের দারিদ্র্য চিন্তা: বাংলাদেশে দারিদ্র্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি*।" বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত আঞ্চলিক সেমিনার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ভবন, রাজশাহী: ১৫ জুলাই ২০০৬।

BARKAT, A. (2006). "Economics of Fundamentalism and Growth of Political Islam in Bangladesh," *Social Science Review,* The Dhaka University Studies. Part D, Vol 23, No. 2, December 2006, pp. 1-32.

BARKAT, A. (2006). "Economics of Fundamentalism and the Growth of Political Islam in Bangladesh" in *Social Science Review*, The Dhaka University Studies, Vol-23, No-2, Dec. 2006.

বারকাত, আবুল, (২০০৬). "বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতি", তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা।

BARKAT, A. (2005). "Criminalization of Politics in Bangladesh", SASNET Lecture, Lund University, Sweden, 15 March 2005;

BARKAT, A. (2005). "Right to Development and Human Development: The Case of Bangladesh", Lecture Session organized by Sida and FÖreningen for SUS, Sida Auditorium, Stockholm, Anthony Giddens, 2003. Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives, 50-51।

BARKAT, A. (2005). "Right to Development and Human Development: The Case of Bangladesh", Lecture Session organized by Sida and FÖreningen for SUS, Sida Auditorium, Stockholm, Sweden, 18 March 2005.

বারকাত, আবুল, (২০০৫). "*ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার: মহা বিপর্যয় রোধে সেকুলার ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই*।" সেকুলার ইউনিটি বাংলাদেশের জন্য উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধ, ঢাকা: জাতীয় প্রেস ক্লাব। ৩১ ডিসেম্বর ২০০৫।

বারকাত, আবুল, (২০০৫). "বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতি।" ড. আবুল গফুর স্মারক বক্তৃতা। *সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র* বিষয় ভিত্তিক গবেষণামূলক ষান্মাসিক পত্রিকা। ২০ এপ্রিল, ২০০৫। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী।

BARKAT, A. (2005). *"Economics of Fundamentalism in Bangladesh: Roots, Strengths, and Limits to Growth".* Presented at South Asia Conference on Social and Religious Fragmentation and Economic Development. Cornell University (USA): 15-17 October 2005.

বারকাত, আবুল, (২০০৪). "গভীর ষড়যন্ত্রের পথ ধরে দেশ গাঢ় অন্ধকারের দিকে এগুচ্ছে", দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ আগস্ট ২০০৪। এই লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিলো ২০০৪ সালের ২১ আগস্টের ঠিক আগের দিনে, যে দিন তৎকালিন বিরোধী দলীয় নেতা শেখ হাসিনার ঢাকার জনসভায় জঙ্গিরা গ্রেনেড হামলা করে। যে হামলায় নিহত হন ২৪ জন আর চির পঙ্গুত্বসহ মারাত্মক আহত হন ৫০৩ জন।

বারকাত, আবুল, (২০০৪). *সাম্প্রদায়িকতা রুখতে হবে– অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রগতিশীল শক্তির ঐক্য জরুরি।* জাতীয় সংলাপে বক্তব্য, প্রেস ক্লাব, ঢাকা: ২৩ মে, ২০০৪।

বারকাত, আবুল, (২০০২). "*বাংলাদেশের স্বাধীনতাত্তোর তিরিশ বছরের অর্থনীতি: মানব কল্যাণে ব্যর্থতার ইতিহাস*।" বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ আয়োজিত *বাংলাদেশ: স্বাধীনতার ত্রিশ বছর* শীর্ষক বিশেষ সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ, কনফারেন্স হল, বিজনেস স্টাডিজ একাডেমিক ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা: ২৬ এপ্রিল ২০০২।

বারকাত, আবুল, (১৯৯০). "আমেরিকায় পুঁজিবাদ বিকাশের ইতিহাস প্রসঙ্গে: একটি মার্কসীয় বিশ্লেষণ।" *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, খণ্ড ৩৭, জুন ১৯৯০, পৃ. ১-২০।

CAPRA, Fritjof. (1988). *The Turning Point: Science, Society, and the Rising Culture*. New York: Bantam Books.

COLLINS, Chuck. (2012). 99 To 1: How Wealth Inequality is Wrecking the World and What We Can Do About It. Noida: HarperCollins Publishers India Ltd, পৃ: ২।

CHOMSKY, Noam. (2005). *Imperial Ambitions.* London: Penguin Books.

CHOMSKY, Noam. (2004). Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance, New York: Penguin Books.

CHOMSKY, Noam. (2003). *Imperial Ambitions: Conversations with Noam Chomsky on the Post – 9/11 World, Interviews with David Barsamian.* New York: Hamish Hamilton, Penguin Books.

CHOMSKY, Noam. (2002). Reflections on 9/11, in The Essential Chomsky (Arnove Anthony, New Delhi: Penguin Books India, 2008, পৃ: ৩৪৩।

CHOMSKY, Noam. (1967). "On Resistance", in The Essential Chomsky (Arnove Anthony, ed.) New Delhi: 2008.

EATON, Richard. M. (1996). *The Rise of Islam and Bengal Frontier-1204 to 1760.* California: University of California Press.

ESPOSITO, John. L and D MOGAHED. (2007). Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think. Based on Gallup's World Poll-the largest study of its kind. New York: Gallup Press.

ইমাম, এইচ টি, (২০১১). স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু। নুহ-উল-আলম লেনিন কর্তৃক সম্পাদিত সংকলন গ্রন্থ "*ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু*"। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, আগস্ট ২০১১।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (সর্বশেষ সংশোধনিসহ মুদ্রিত, অক্টোবর ২০১১). গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

GODOY, Julio, (1990). Latin American Documentation (LADOC), *Torture in Latin America, (Lima, Peru), 1987. Nation,* 5 March, 1990

HERRING, George. (2008). From Colony to Superpower. U.S. Foreign Relations Since 1776. New York: Oxford University Press. পৃ: ৩০৭-৩০৮।

খান, মিজানুর রহমান, (২০১৪). *মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশনা।

লেনিন, নূহ-উল-আলম (সম্পাদিত), (২০১১). *ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু*। ঢাকা: আওয়ামী লীগ।

লেনিন, ভ.ই. (তারিখহীন), সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদীদের প্রসঙ্গে (লেনিনের ১৯১৫ সালে লেখা এবং ১৯২৭ সালে ২১ জানুয়ারি ১৭ নং 'প্রাভদা'য় প্রথম প্রকাশিত)। মস্কো: প্রগতি প্রকাশন।

লেনিন, ভ.ই, (১৯৮০). "সাম্রাজ্যবাদ– পুজিঁবাদের সর্বোচ্চ স্তর"। (লেনিন কর্তৃক জানুয়ারি-জুন ১৯১৬ সালে রচিত এবং ২৬ এপ্রিল ১৯১৭ সালে প্রথম প্রকাশিত), ভ.ই. লেনিন রচনা সমগ্র (রুশ ভাষায়), পঞ্চম সংস্করণ, খণ্ড ২৭, পৃ: ২৯৯-৪২৬। মস্কো: পলিটিক্যাল লিটারেচার প্রকাশনা।

রহমান, ড. মো. মাহবুবুর, (২০১১). "বঙ্গবন্ধুর শাসনামল।" নূহ-উল-আলম লেনিন কর্তৃক সম্পাদিত সংকলন গ্রন্থ "*ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু*" বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, আগস্ট ২০১১।

STIGLITZ, J. E. (2013). *The Price of Inequality*.New York: Penguin Books, পৃঃ ২-৩।

STIGLITZ, J. E, (2002). *Globalization and Its Discontents.* New York: Allen Lane, Penguin Press.

সুফী, মোতাহার হোসেন, (২০০৯), *ইতিহাসের মহানায়ক জাতির জনক* (দ্বিতীয় সংস্করণ)। ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনা।

"The Monroe Doctrine. (1823)". Basic Readings in the US Democracy. United State Depertment of State.

The Politics Book, (2013)., London: Dorling Kindersley Limited.